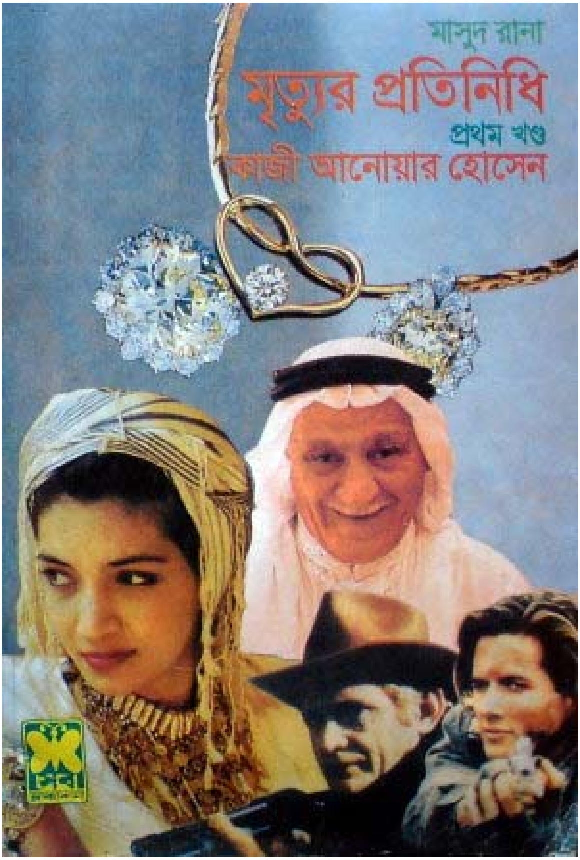

মাসুদ রানা
মৃত্যুর প্রতিনিধি
প্রথম খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা

মাসুদ রানা

মৃত্যুর প্রতিনিধি-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

আকাশে চাঁদ নেই আজ। তারাও নেই। কালিগোলা অন্ধকারে ডুবে আছে বিশ্ব চরাচর।

বড়সড় একটা জলজ দানবের মত পানির বুক চিরে তরতর করে এগিয়ে চলেছে জাহাজটা। নেভিগেশন লাইট জ্বালানো হয়নি। আলোর বিন্দুমাত্র আভাস নেই জাহাজের আর কোথাও। বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত ঘুটঘুটে অন্ধকার।

ভৌতিক একটা অবয়ব। গুঁড়ি মেরে সন্তর্পণে এগোচ্ছে। হুইল হাউসে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন জাহাজটির ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন, ফ্র্যাঙ্ক রকফোর্ড। ভেতরে ভেতরে সাঙ্ঘাতিক উৎকণ্ঠিত।

দু'হাজার টনি 'লোট্টি ও মারা' নিয়ে এক সপ্তাহ আগে কুয়েত এসেছিলেন রকফোর্ড বিভিন্ন ব্রিটিশ ভোগ্যপণ্য নিয়ে। আজ ফিরে চলেছেন স্বদেশে। শূন্য জাহাজ নিয়ে। এবারই প্রথম এমনটি ঘটল। আগে কখনও শূন্য যায়নি লোট্টি ও মারা। ব্যাপারটা অকল্পনীয়।

কিন্তু কি আর করা! যেদিন কুয়েত বন্দরে নোঙর করেন রকফোর্ড, সেই দিনই সন্ধের পর ব্রিটিশ দূতাবাসে তলব করা হয় তাঁকে। জরুরী তলব। কী–না, উপসাগরীয় বাতাসের মতিগতি

ভাল নয়। ইরাক কুয়েত বর্ডারে সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে শুরু করেছে, যে কোন মুহূর্তে যা খুশি তাই ঘটে যেতে পারে বলে সিআইএ এবং স্থানীয় ব্রিটিশ সংস্থাগুলো আশঙ্কা করছে।

অতএব মাল যত দ্রুত সম্ভব খালাস করতে হবে রকফোর্ডকে, এবং পালাতে হবে বন্দর ছেড়ে। এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না। কেবল লোট্টি ও মারার বেলাই নয়, অন্য সমস্ত ইঙ্গ-মার্কিন জাহাজের ক্যাপ্টেনদের ডেকেও একই নির্দেশ জানিয়ে দিয়েছে যার যার দূতাবাস।

নির্দেশটার গুরুত্ব বুঝতে ভুল করেননি অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন। পরদিনই ফিরে যাওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য-পানীয়সহ অন্যান্য সাপ্লাই কিনে স্টোর ভরে ফেলেছিলেন তিনি। শুধু ফুয়েল ট্যাঙ্ক ভরার কাজ বাকি ছিল, আজই সকালে সেরেছেন সেটা। তারপর সন্ধে নামতেই দে ছুট্। কোনদিক দেখাদেখি নেই।

অবশ্য জাহাজ যে একেবারেই শূন্য, তা কিন্তু নয়। মাল রাখার খোলে কিছু নেই ঠিকই, তবে ওপরের এক কেবিনে আছেন একজন যাত্রী। অত্যন্ত মূল্যবান এক যাত্রী। ধনকুবের এক কুয়েতি শেখ। কুয়েতে ব্রিটিশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারির বিশিষ্ট বন্ধু। বন্ধুর মুখে কুয়েতে সম্ভাব্য ইরাকি আগ্রাসনের আভাস পাওয়ামাত্র দেশ ত্যাগের জন্যে তৈরি হয়ে যান শেখ। ষাটের বেশি বয়স ভদ্রলোকের, বিপত্নীক। এক নাতনী ছাড়া আর কেউ নেই। নিউ ইয়র্কে পড়াশুনা করে সে।

পয়সার অভাব নেই ভদ্রলোকের। প্রতিবছর অকল্পনীয় অঙ্কের অর্থ ওড়ান শখের পিছনে। অদ্ভুত শখ তাঁর। পৃথিবীর যেখানে যত হীরে-জহরৎ, মণি-মুক্তার নীলাম হয়, সেখানেই হাজির হয়ে যান। বগলদাবা করে নিয়ে আসেন সব। সাফাত সিটিতে নিজের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বিশাল এক গ্যালারি বানিয়ে সেখানেই

সে সব সংরক্ষণ করেন তিনি।

কোটি কোটি ডলার মূল্যের রত্ন সম্ভার। অনেকের মতে এই পরিমাণ টাকায় কুয়েতের পাঁচ বছরের প্রতিরক্ষা ব্যয় অনায়াসে মেটানো সম্ভব। বন্ধুর মুখে ইরাকের সম্ভাব্য মতলব শুনে ভীষণরকম ঘাবড়ে যান ভদ্রলোক, কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টিভির কল্যাণে এই অদ্ভুত শখের জন্যে দুনিয়ার প্রায় সবাই কমবেশি চেনে তাঁকে, ইরাক তো বাড়ির কাছে।

সত্যিই যদি ওরা কুয়েত আক্রমণ করে, রত্ন ভাণ্ডার তো পরের কথা, গ্যালারির একটা ইঁটও অবশিষ্ট থাকবে না। বন্ধুকে ধরে বসলেন শেখ পরিত্রাণের একটা উপায় খুঁজে দেয়ার জন্যে। অনেক ভেবে বুদ্ধি দিলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি, ওসব নিয়ে পালিয়ে যাও ইংল্যান্ডে। তাঁরই সহায়তায় লোট্টি ও মারায় প্যাসেজ পেয়েছেন ভদ্রলোক। সঙ্গে তিনটে বড়সড় ব্রিফকেসে রয়েছে তাঁর ভাণ্ডার।

নামে তাঁকে ভালই চেনেন ফ্র্যাঙ্ক রকফোর্ড। ফার্স্ট সেক্রেটারি খানিকটা আভাসও দিয়েছেন কি আছে ব্রিফকেসগুলোয়, ওটাই তাঁর উৎকণ্ঠার কারণ। শুধু ওগুলোর নিরাপত্তার কথা ভেবেই নেভিগেশন রুলের প্রতি বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন আজ রকফোর্ড। বন্দর ছেড়ে আসার ঘণ্টাখানেক পর হঠাৎ করে নিভিয়ে দিয়েছেন লোট্টি ও মারার সমস্ত আলো। কোনদিকে চলেছেন বুঝতে দিতে চান না কাউকে। অন্তত গালফ অভ ওমানে না পড়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই তাঁর। যাত্রীটি যেমন অমূল্য, তেমনি বিপজ্জনকও বটেন।

পায়ের নিচে ডেকের মৃদু, ছন্দোবদ্ধ কাঁপন অনুভব করছেন ফ্র্যাঙ্ক রকফোর্ড, সেই সঙ্গে ডিজেল এঞ্জিনের গুরুগম্ভীর ধুক্ পুক্ ধুক্ পুক্। জাহাজটা বেশ পুরানো। তেমনি পুরানো তিনি নিজে।

প্রায় চল্লিশ বছর হলো এর ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব পালন করে আসছেন ফ্র্যাঙ্ক রকফোর্ড। লক্ষ লক্ষ মাইল সাগর পাড়ি দেয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর।

লোট্টি ও মারার সবকিছু, স-বকিছু রকফোর্ডের নখদর্পণে। তাঁর জানা আছে আর বেশিদিন চলবে না এটা, সময় ফুরিয়ে এসেছে। আর বড়জোর পাঁচ বছর, তারপর পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে হবে লোট্টি ও মারাকে। সম্ভবত সেই কারণেই দিন দিন জাহাজটার ওপর মায়া বেড়েই চলেছে তাঁর। অনুভূতিটা এমন, যা কাউকে কোনমতেই ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবে না।

একটা ছোট, কালো চুরুট ধরালেন ক্যাপ্টেন। মাঝরাতের পর খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে মেঘের আড়াল ছেড়ে উঁকি দিল আধ খাওয়া চাঁদ। তারপর আবার অন্ধকার। অ্যামিডশিপের দিকে যাত্রীটি কি করছেন দেখতে একবার যাবেন কিনা ভাবলেন রকফোর্ড। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তাটা বাতিল করে দিলেন। দরকার নেই। ভদ্রলোককে যথাসম্ভব বিরক্ত না করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। কেবল তিনি যখন চাইবেন, এক কাপ হালকা লিকারের দার্জিলিং চা বা খাবার সার্ভ করার সময় ছাড়া কেউ যেন তাঁর কেবিনে না যায়, সেদিকে লক্ষ রাখতে বলে দিয়েছেন। দিনে-রাতে দশবার চা পান করেন শেখ।

কত টাকা ভদ্রলোকের? ভাবলেন রকফোর্ড, কত বিলিয়ন ডলার? সন্ধের ঠিক আগে যখন জাহাজে এসে উঠলেন ঘর্মাক্ত শেখ, দেখে মনে হচ্ছিল এইমাত্র যেন গোসল করে এসেছে মানুষটা। চেহারা ফ্যাকাসে, চোখ দুটো অস্থির। যেন কেউ 'অ্যাই!' বললেই ঝেড়ে দৌড় দেবেন যে দিকে দু'চোখ যায়। বেচারী! পরে যখন কেবিনে ডাকিয়ে নিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন ফার্স্ট সেক্রেটারি, তিন অক্ষরের শব্দটা মনে

মনে কয়েকবার আওড়েছিলেন রকফোর্ড। তাঁর মনে হয়েছে, ভয়ে ভেতরে ভেতরে মরে আছেন যেন শেখ।

তোয়ালে সাইজের বড় একটা রুমাল দিয়ে ঘন ঘন মুখের-ঘাড়ের ঘাম মুছছিলেন, আর বিড়বিড় করে কী সব যেন বলছিলেন। কেন যে মানুষের এত টাকা হয়, আর শখের পিছনে এত টাকা ঢালে মানুষ, ভেবে পান না রকফোর্ড। পালাও এখন পকেটের টাকায় কেনা গলার কাঁটা আর গলা মুঠোয় নিয়ে। যত্তোসব!

হুইল হাউস থেকে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। হাঁটাহাঁটি করতে লাগলেন ডেকে। ভারি ঠাণ্ডা শেষ মার্চের রাত। ফুসফুস ভরে বরফ ঠাণ্ডা বাতাস টেনে নিলেন তিনি, বুকটা জ্বলে উঠল যেন। উপসাগরের কালো বুকে চোখ রাখলেন ক্যাপ্টেন। পানি নয়, বিশাল এক দোয়াত কালি উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে যেন কেউ। বড় আকারের একটা পোকার মত লোট্টি ও মারা হাবুডুবু খাচ্ছে তার মধ্যে।

নিভে যাওয়া চুরুটটা ছুঁড়ে পানিতে ফেলে দিলেন ফ্র্যাঙ্ক রকফোর্ড। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে তাকালেন। তরুণ সীম্যান পাগানকে দেখা গেল এদিকেই আসছে। কোন প্রশ্ন না করে চেয়ে থাকলেন ক্যাপ্টেন। তাঁর চার হাতের মধ্যে পৌঁছে দাঁড়াল পাগান।

'ভদ্রলোক চা খেতে চেয়েছেন, স্যার।'

'দিয়ে এসো। খুব হালকা করে বানাতে বলবে চা। খুব হালকা।'

'আই, ক্যাপ্টেন,' ঘুরে দাঁড়াতে গেল সীম্যান।

'না, দাঁড়াও। চা করে নিয়ে এসো, আমিই নিয়ে যাব ওঁর কেবিনে।'

দু'চোখ সামান্য বিস্ফারিত হলো পাগানের। 'আপনি চা নিয়ে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'আই আই, স্যার।' ঘুরে দাঁড়াল সীম্যান। অদৃশ্য হয়ে গেল।

দাঁতের সঙ্গে সেঁটে থাকা খানিকটা তামাক পাতা আবিষ্কার করে জিভ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলে আনলেন ফ্র্যাঙ্ক রকফোর্ড, 'থোক্' করে ফেলে দিলেন। তারপর মন দিলেন এঞ্জিনের গান শোনায়।

ঠিক যেন তাঁর হৃদস্পন্দনের আওয়াজ ওটা। একই রকম শোনাচ্ছে। আরও কয়েক পা হাঁটলেন ক্যাপ্টেন। মনে হলো আওয়াজটার প্রকৃতি হঠাৎ করেই যেন পাল্টে গেল, কেমন অন্যরকম শোনাচ্ছে এখন। টের পেলেন তিনি, ছন্দোপতন ঘটেছে কোথাও। অজানা এক অস্বস্তি চেপে ধরতে শুরু করেছে তাঁকে। অন্ধকারে কারা যেন ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে রকফোর্ডের বিরুদ্ধে।

এঞ্জিন রূম।

সেকেণ্ড এঞ্জিনিয়ার মানুষটা খাটো, চেহারা ছুঁচোর মত। নাম মাইক পটার। তেল-কালি মেখে একাকার পুরানো একজোড়া কভারলস্ পরে আছে সে। মাথায় উলের টুপি। টুপির কিনারা টেনে কানের নিচ পর্যন্ত নামিয়ে রেখেছে পটার। যেন শীত ঠেকাচ্ছে।

যদিও বিন্দুমাত্র ঠাণ্ডা নেই এঞ্জিন রূমে। বরং গরমই লাগছে এখানে। কিন্তু দুটোর একটাও অনুভব করছে না লোকটা। অন্য ধান্ধায় রয়েছে সে, ঠাণ্ডা-গরম অনুভব করার মত বোধ হারিয়ে ফেলেছে সাময়িকভাবে। হাতঘড়িতে চোখ বোলাল মাইক পটার,

বারোটা বাজতে দু'মিনিট বাকি।

ঠিক বারোটায়, ভাবল লোকটা, লোট্টি ও মারাকে নিশ্চল করে দিতে হবে।

তেলতেলে মুখটা নোংরা দুই হাতে ডলল মাইক পটার। মন দিয়ে খানিকক্ষণ এঞ্জিনের আওয়াজ শুনল। তারপর ঘুরে ঘুরে ভালভ আর প্রেশার গজ পরীক্ষার ভান করতে লাগল। ওপাশে একটা কাঠের টুলে বসে টিনের মগে কফি পান করছে চীফ এঞ্জিনিয়ার জ্যাক ফ্লেমিং। হাতে একটা ম্যাগাজিন, উল্টেপাল্টে দেখছে। পটারের দিকে পিছন ফিরে বসা সে।

কভারলসের পকেট থেকে দীর্ঘ, ভারি একটা রেঞ্চ বের করল পটার। হাতে নাচিয়ে জিনিসটার ওজন বুঝে নিল। এই সময় শব্দ করে হেসে উঠল ফার্স্ট এঞ্জিনিয়ার কিছু একটা পড়ে। এদিক না ফিরেই অনুচ্চ স্বরে বলল কি যেন পটারকে। খেয়াল করল না সে। অন্য ভাবনায় আছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটতে যাচ্ছে ব্যাপারটা, এবং কয়েকদিনের মধ্যেই কোটিপতি বনে যাচ্ছে সে, এইসব।

জ্যাক ফ্লেমিঙের বড়সড় মাথার পিছন দিকটা দেখল পটার ভাল করে, কাছে এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে। তারপর গায়ের জোরে রেঞ্চটা চালাল তার ডান কানের পিছনে খুলি সই করে। গুঙিয়ে উঠল ফার্স্ট এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু আশ্চর্য! পড়ল না, বসে থাকল খাড়া। বরং পটারের কলজের পানি জমিয়ে দিয়ে ঘুরে তাকাল ধীরে ধীরে। চাউনিতে অবিশ্বাস, ঘৃণা, ক্রোধ আরও কী সব যেন।

আঁতকে উঠেই আবার রেঞ্চ হাঁকাল সেকেণ্ড এঞ্জিনিয়ার, এবার তার নাক সই করে। মুহূর্তে রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল লোকটার সারা মুখ। কফির মগ, ম্যাগাজিন, দুটোই ছুটে গেল

হাত থেকে। টুল উল্টে গেল, হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ল ফ্লেমিং, দু'হাতে মুখ চেপে ধরেছে। যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে।

'জেসাস গড!' বিড়বিড় করে বলল মাইক পটার। অস্ফুটে ফুঁপিয়ে উঠে শেষবারের মত আঘাত হানল লোকটার মাথার তালু লক্ষ্য করে। খুলি ভাঙার আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল সে এবার। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ফার্স্ট এঞ্জিনিয়ারের কাতরানি। সেজদার ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল লোকটা। পরমুহূর্তে গড়িয়ে পড়ল লাশ হয়ে।

বারোটার পর এক মিনিট গড়িয়ে গেছে তখন।

পর পর দু'বার মৃদু নক্ করে কেবিনের দরজা খুলে ফেলল পাগান। পুরু গদি মোড়া বিছানায় শুয়ে এদিকেই তাকিয়ে ছিলেন যাত্রীটি, উঠে বসলেন ধড়মড় করে। মনে মনে হাসল পাগান। 'আপনার চা, স্যার।'

'চা!' সামলে নিয়ে বিস্মিত চোখে তাকালেন আরব। 'কই, আমি তো চা চাইনি!'

'ক্যাপ্টেন পাঠিয়েছেন, স্যার,' অত্যন্ত সপ্রতিভ কণ্ঠে বলল সীম্যান। 'উনি জানতে চেয়েছেন আপনার আর কিছু লাগবে কি না।'

উত্তর দিলেন না শেখ। চেহারা দেখে বোঝা যায় বেশ বিরক্ত হয়েছেন। মাথা দুলিয়ে লোকটাকে বেরিয়ে যেতে ইঙ্গিত করলেন তিনি। তাই করল পাগান, তবে তার আগে তাঁর ব্রিফকেস তিনটের ওপর নজর বুলিয়ে নিল এক পলক। ওগুলোর হাতল এক করে পুরু স্টেইনলেস স্টীলের চেইন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। চেইনের অন্য প্রান্ত হ্যাণ্ডকাফের মত করে বাঁধা মালিকের বাঁ কব্জিতে।

লোকটা বেরিয়ে যেতে উঠে বসলেন ধনাঢ্য আরব। সামনেই একটা টিপয়ে চায়ের ট্রে রেখে গেছে সে। হাত বাড়িয়ে কাপটা নিলেন তিনি। ভাবলেন ভালই হলো, তেষ্টায় গলা প্রায় কাঠ হয়ে আছে। মনে মনে ক্যাপ্টেনের প্রশংসা করতে করতে চায়ে চুমুক দিলেন শেখ।

স্বাদটা যেন কেমন লাগল। চিনি নিশ্চই বেশি দিয়ে ফেলেছে ব্যাটারা!

আবার চুমুক দিলেন তিনি। এবং পরমুহূর্তে মনে হলো দেহের সমস্ত রক্ত তীরবেগে তাঁর মাথা লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করেছে। পানিতে ভরে উঠল চোখ, সামনের সবকিছু ঝাপসা হয়ে এল। একই সঙ্গে শেখের মনে হলো, ইস্পাতের একজোড়া হাত যেন সর্বশক্তিতে টিপে ধরেছে তাঁর হৃৎপিণ্ড। ভীষণভাবে দুলে উঠলেন শেখ, লাগল যেন এখনই গ্রেনেডের মত বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছেন তিনি।

দম নিতে পারছেন না, গলা দিয়ে শক্ত আর খুব বেশি গরম কিছু একটা ঠেলে ওপরে উঠে আসছে। উঠে দাঁড়াতে চাইলেন শেখ, কিন্তু পা দুটো যেন আর কোথাও রেখে এসেছেন তিনি, সঙ্গে নেই। বাঙ্কের কিনারা গলে পিছলে ডেকে পড়ে গেলেন আরব, কাপ-ট্রেসহ টি পয়টা অনুসরণ করল তাঁকে।

চিত হয়ে পড়ে মুখ হাঁ করে দম নেয়ার জন্যে সংগ্রাম শুরু করেছেন বৃদ্ধ শেখ। এর মধ্যেও দুটো বিষয় তিনি পরিষ্কার উপলব্ধি করলেন।

এক. তিনি মারা যাচ্ছেন।

এবং দুই. পিঠের নিচের দুলুনি হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে গেছে। এঞ্জিনের আওয়াজ নেই। কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে চারদিকের পরিবেশে।

হঠাৎ ব্যাপারটা খেয়াল হতে ভুরু কোঁচকালেন ক্যাপ্টেন ফ্র্যাঙ্ক রকফোর্ড। ব্যাটা, হারামজাদা! এক কাপ চা করে আনতে এত সময় লাগে? গ্যালির দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিলেন তিনি, পরক্ষণে জায়গায় জমে গেলেন।

এঞ্জিন থেমে গেছে। সেই সঙ্গে থেমে গেছে ক্যাপ্টেনের রক্ত চলাচল। নিশ্চই মারাত্মক কোন ত্রুটি দেখা দিয়েছে এঞ্জিনে, যা আরও অনেক আগেই ঘটার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত ছিলেন রকফোর্ড। ব্যস্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়াতে গেলেন তিনি, আবারও থেমে পড়তে হলো। চোখ কপালে তুলে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ক্যাপ্টেন।

লোট্টি ও মারার শ'খানেক গজ সামনে ধীরে ধীরে আকার লাভ করছে সাদা রঙের একটা ইয়ট, আঁধার ফুঁড়ে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। ওটাতেও কোন আলো জ্বলছে না। রকফোর্ডের মনে হলো পানি ফুঁড়ে আচমকা উদয় হওয়া জাহাজটায় নিঃসন্দেহে কেউ নেই। ওটা নিশ্চই ভৌতিক কিছু হবে।

দৃষ্টি যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে দেখতে থাকলেন ক্যাপ্টেন। কোন ফ্ল্যাগ নেই ওটায়, নেই-কোন আইডেন্টিফাইং সাইন। বো-তে কোন নাম নেই, প্রাণেরও কোন চিহ্ন নেই ডেকে। এর মানে কি?

ওটাকে একটা ষাট ফুটি ডিজেল ইয়ট বলে মনে হলো রকফোর্ডের। মনে হলো, নিশ্চিত নন তিনি। সার্চ লাইট জ্বেলে যে দেখবেন, তাও সম্ভব নয়। আরও অন্তত দু'ঘণ্টা নিজেকে লুকিয়ে রেখেই এগোতে চান তিনি। কি ওটা? চট করে আকাশের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। কয়েক মুহূর্তের জন্যে যদি মেঘ সরিয়ে

চাঁদটা উঁকি দিত! আচমকা একটা ঝাঁকি খেয়ে সিধে হলেন রকফোর্ড।

কে যেন ভেতর থেকে বলে উঠল, সাবধান, রকফোর্ড! সামনে বিপদ!

এক দৌড়ে ব্রিজে গিয়ে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন। ঝটকা মেরে গান কেবিনেটের পাল্লা খুলে ফেললেন। ভেতরে সাজানো রয়েছে দশটা পিস্তল, ছয়টা সেমি অটোমেটিক রাইফেল। একটা রাইফেল নিলেন তিনি। কাজের ফাঁকে ঘাড় ঘুরিয়ে রহস্যময় জলযানটার দিকে তাকালেন এক পলক।

একটু একটু করে এগিয়েই আসছে ওটা। থামার বা লোট্টি ও মারার পথ থেকে সরে যাওয়ার কোন লক্ষণ নেই। যেন দুটোর সংঘর্ষ না ঘটা পর্যন্ত থামবে না পণ করেছে ওটা। বিপদ সঙ্কেত বাজিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন রকফোর্ড। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডেকে দুদ্দাড় কয়েক জোড়া পায়ের আওয়াজ উঠল, দৌড়ে আসছে লোট্টি ও মারার ক্রুরা।

তাদের কয়েকজন সবে ঘুম থেকে উঠে এসেছে, পরনে লম্বা থার্মাল আন্ডারওয়্যার ছাড়া আর কিছু নেই। সবার হাতে অস্ত্র-গুলি তুলে দিলেন রকফোর্ড। নির্দেশ দিলেন, তাঁর সঙ্কেত না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেন গুলি না ছোঁড়ে। তারপর রেলিঙের কাছে গিয়ে আবার নজর দিলেন সাদা ইয়টটার গতিবিধির দিকে। অনেক কাছে এসে পড়েছে ওটা।

সত্তর গজ!

ষাট!

ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না-ও হতে পারে হয়তো, ভাবলেন একবার তিনি। হয়তো অনভিজ্ঞ কোন ট্যুরিস্ট জাহাজ চালনা শেখার চেষ্টা করছে। অথবা…নিজেকে চোখ রাঙালেন ক্যাপ্টেন,

কী সব আবোল তাবোল ভাবছেন তিনি? ওটা নিশ্চই কোন...নিশ্চই কোন... ।

আরও কাছে এসে পড়েছে ইয়টটা ।

পঞ্চাশ গজ...

চল্লিশ...

হঠাৎ মনে হলো, ওটা মেরি সেলেস্টি নয় তো? সেই রহস্যময় প্রাণের স্পন্দনহীন জাহাজ, যে বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে নিজের মৃত নাবিকদের কঙ্কাল? হঠাৎ হঠাৎ উদয় হয় যেখানে-সেখানে? আবার গায়েব হয়ে যায় চোখের পলকে? অনেকেই তো দেখেছে মেরি সেলেস্টিকে, সেটাই নয় তো? অসংখ্য সাগর-রহস্যের মধ্যে যাকে বাস্তব বলে মেনে নিয়েছে পৃথিবী?

পঁচিশ গজ!

বিশ!

বাঁ হাতটা নিঃশব্দে শূন্যে তুললেন ক্যাপ্টেন রকফোর্ড । গুলি চালানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই । অনেক গুরু দায়িত্ব তাঁর কাঁধে তুলে দিয়েছেন কুয়েতের ব্রিটিশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি, তা পালন করতেই হবে । তাতে যদি প্রাণও যায়, তাও সই । হঠাৎ হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল ক্যাপ্টেনের । ওই লোকের ব্রিফকেস তিনটে লুট করার...এঞ্জিনের হলো কি?

সঙ্কেত পুরো করার সময় পেলেন না ক্যাপ্টেন, ইয়ট থেকে নীলচে সাদা আলোর মোটা একটা স্তম্ভ ছুটে এসে আছড়ে পড়ল লোট্টির ওপর । দিনের মত আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক । চোখ ঝলসে গেল, চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন রকফোর্ড । পরমুহূর্তে একটা মোটা গলার দুর্বোধ্য কমাণ্ড ভেসে এল ইয়ট থেকে । ওটা কোন ভাষা ধরতে পারলেন না তিনি ।

পনেরো গজ!

দশ গজ!

আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে। অস্ত্র বিশারদ নন ক্যাপ্টেন, তবু বেশ টের পেলেন পিস্তল আর রাইফেলই নয়, আরও ভারি কিছু ব্যবহার করছে ও পক্ষ। রকেট লঞ্চার সম্ভবত। এবং সেই সঙ্গে হ্যাণ্ড গ্রেনেডও। ডজন ডজন গান মাজলের বিরতিহীন ঝলকে আলো আরও জোরাল হলো, রণক্ষেত্রে পরিণত হলো সাগর।

ব্রিজের কাঁচ, কাঠের প্যানেলিং চুরমার হয়ে বোলতার গুঞ্জন তুলে বিদ্যুৎগতিতে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। মর্টারের ক্রমাগত আঘাতে লোট্টি ও মারার পুরানো খোল তুবড়ে-বেঁকে একাকার হয়ে গেল। বড় বড় ছিদ্র হয়ে প্রায় চালুনির রূপ পেয়েছে পোর্ট সাইডের খোল আর বাল্কহেড।

ডেকে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন ফ্র্যাঙ্ক রকফোর্ড। মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে চলছে শত্রুর গুলিবর্ষণ, কোনদিন থামবে বলে ভরসা হয় না। মাথার ওপর দিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটছে কাঁচ-কাঠের টুকরো, আরও কি কি ঈশ্বরই জানেন। আচমকা গোলাগুলি শুরুর মুহূর্তে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়া ক্রুদের যারা এখনও মরেনি, তাদের গোঙানি আর আর্ত চিৎকারে ভারি হয়ে উঠেছে করডাইটের গন্ধ মাখা প্রায় স্থির বাতাস। বেশিরভাগই মারা গেছে তারা।

একটা কাঁচের টুকরো ছিটকে এসে আঘাত করল ক্যাপ্টেনের কপালে। জায়গাটা কেটে দরদর করে রক্ত গড়িয়ে নামতে শুরু করেছে, কিন্তু খেয়াল নেই তাঁর। তিনি যাত্রীটির কথা ভাবছেন। নিশ্চই ওই লোকটির জন্যেই আক্রান্ত হয়েছে লোট্টি ও মারা। নইলে আর কি কারণ থাকতে পারে এর? এত বছরের অভিজ্ঞতা তাঁর, এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা নিজের জাহাজকে কেন্দ্র করে

ঘটতে পারে, কল্পনাও করেননি কখনও।

ক্রাইস্ট ইন হেভেন! যাত্রীটিকে এ সময় সাহায্য করা রকফোর্ডের পবিত্র দায়িত্ব। কিন্তু নিজেই মাথা তুলতে পারছেন না, অন্যকে কি ছাই সাহায্য করবেন তিনি? তবু, এত কিছুর মধ্যেও স্বাভাবিক দায়িত্ব ও বিবেচনা বোধ হারাননি ক্যাপ্টেন। সিদ্ধান্ত নিলেন ক্রল করে অ্যামিডশিপে যাবেন, শত্রুর চোখ বাঁচিয়ে ভদ্রলোককে লাইফবোর্ডে তুলে দিয়ে সরে পড়তে সাহায্য করবেন।

সময় যেন নির্ধারণ করাই ছিল, এক যোগে থেমে গেল শত্রুর সবগুলো অস্ত্র। অকস্মাৎ নীরবতা পাথরের মত চেপে বসল পরিবেশের ওপর।

মুখটা সামান্য তুললেন ফ্র্যাঙ্ক রকফোর্ড, পিট্‌পিট্‌ করে তাকালেন আলোর আড়াআড়ি স্তম্ভটার দিকে। আগে তবু অস্পষ্ট হলেও দেখতে পাচ্ছিলেন ইয়টটাকে, এখন পারছেন না। আলোর পিছনে সব অন্ধকার। উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগলেন ক্যাপ্টেন তবু, যদি কাউকে দেখা যায়! নাহ্‌! কিছুই দেখা যায় না।

রাইফেলটা শিথিল মুঠোয় ধরে আস্তে আস্তে উঠে বসলেন ক্যাপ্টেন হাঁটুতে ভর দিয়ে। আশেপাশে হাত পা ছড়িয়ে নানান ভঙ্গিতে পড়ে আছে অনেকগুলো লাশ। বেদনায় বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। কোন অপরাধ ছিল না মানুষগুলোর। তবু মরতে হলো। পৃথিবীতে বাড়ল আরও কিছু পিতৃহারা, বিধবার সংখ্যা। একটা কি দুটো দেহ এখনও মৃদু মৃদু নড়ছে ওর মধ্যে। উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন।

এখনও মরেনি ওরা। তবে মরবে। দুনিয়ার সর্বাধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রও লোকগুলোর কোন উপকারে আসবে না। প্রচণ্ড আক্রোশে ভেতরে ভেতরে ফেটে পড়লেন ক্যাপ্টেন। ক্ষমতা নেই,

থাকলে এই মুহূর্তে চরম প্রতিশোধ নিতেন। দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেন ওই সাদা ইয়ট এবং তার দয়ামায়াহীন খুনী আরোহীদের।

তবে কিছু তো এখনও করতে পারেন তিনি। গুলি বর্ষণ থেমে গেছে বলে যে রকফোর্ড বেঁচে গেছেন, এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই। যে কোন মুহূর্তে লোট্টি ও মারার গায়ে ভিড়বে ইয়ট, খুনীর দল উঠে আসবে এটায়। কাজেই বসে বসে মরি কেন? তার আগে যে ক'টাকে পারা যায়...ভাবতে ভাবতে সেমি অটোমেটিকটা তুলে কাঁধে ঠেকালেন।

ট্রিগার টানতে যাবেন, এই সময় শক্ত কি যেন ঠেকল মাথার পিছনে। গুঁতো খেয়ে টলে উঠলেন তিনি, বাধ্য হলেন এক পা এগিয়ে যেতে। সামলে নিয়ে ঘুরে তাকালেন রকফোর্ড। পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সীম্যান পাগান। দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে। ভয়ঙ্করদর্শন একটা রিভলভার শোভা পাচ্ছে তার হাতে।

'তুমি!'

হাসিটা আরও প্রসারিত হলো পাগানের। 'আই, ক্যাপ্টেন।' হাত বাড়াল সে, 'দিন, আপনার বোঝাটা আমাকে দিন।'

হতভম্ব হয়ে কয়েক মুহূর্ত লোকটাকে দেখলেন রকফোর্ড। দাঁতে দাঁত চেপে হিস্ হিস্ করে বললেন, 'বিশ্বাসঘাতক!'

'তা আর বলতে?' ছিনিয়ে নিল পাগান রাইফেলটা।

'শয়তান! দু'মুখো সাপ!'

'একদম ঠিক বলেছেন, ক্যাপ্টেন।'

চুপ মেরে গেলেন ফ্র্যাঙ্ক রকফোর্ড। পাগানকে হাতের অস্ত্র তুলতে দেখে নিজেকে শক্ত করে নিলেন। 'শেষ প্রার্থনা করার জন্যে কিছু সময় দাও আমাকে।'

'কিছু কেন? জায়গামত পৌঁছে যত খুশি নিন না, কে নিষেধ

করতে যাবে?'

আহত এক নাবিক মরণ যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে সেদিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। পরক্ষণেই ট্রিগার টেনে দিল পাগান। মাথার খুলি প্রায় পুরোটাই উড়ে গেল তাঁর। প্রথম কাজ সেরে দ্রুতপায়ে শেখের কেবিনে এসে ঢুকল পাগান। ডেকে বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে পড়ে আছেন শেখ। চোখ দুটো টকটকে লাল, বিস্ফারিত। যেন এখনই লাফিয়ে বেরিয়ে আসবে কোটর ছেড়ে।

ব্যথা সহ্য করার ভঙ্গিতে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা। এক হাতে গলা চেপে ধরেছিলেন শেখ মৃত্যুর আগে, ওভাবেই আছেন। রক্ত জমে জবাফুলের মত হয়ে আছে মুখটা। চোখ সরিয়ে ব্রিফকেস তিনটের ওপর নজর দিল পাগান। হিপ পকেটে রাখা একটা পাউচ থেকে দীর্ঘ, সরু ব্লেডের একটা ছুরি বের করে হাঁটু মুড়ে বসল লাশের পাশে। ব্যস্ত হয়ে পড়ল স্টেইনলেস স্টীলের বাঁধন খুলতে।

ঝাড়া দশ মিনিট খোঁচাখুঁচির পর কুট্ শব্দে খুলে গেল চেইনের বিল্ট ইন তালা। ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল পাগান। রুমাল বের করে ঘাড়ের, মুখের ঘাম মুছল। দু'হাতে বোঝাগুলো নিয়ে বেরিয়ে আসবে, এই সময় বাইরে পায়ের শব্দ উঠল। কে যেন নাম ধরে ডেকে উঠল তাকে।

'আমি এখানে!' হাঁক ছাড়ল পাগান।

দোরগোড়ায় হাজির হলো খাটোমত এক লোক। গাট্টাগোট্টা, পেশীবহুল দেহ। 'পেয়েছ?'

'জ্বি,' অত্যন্ত সমীহের সঙ্গে উত্তর দিল পাগান। 'এই যে।'

ব্রিফকেসগুলো দেখল লোকটা। তারপর লাশটার দিকে তাকাল এক পলক। সন্তুষ্টির হাসি ফুটল মুখে। 'গুড! ভেরি গুড!' কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিস্তল তুলল লোকটা। বুকের বাঁ দিকে

তিন তিনটে ফুটো নিয়ে মৃত শেখের ওপর পিঠ দিয়ে আছড়ে পড়ল বিস্মিত, হতবাক পাগান।

দুই

পয়েন্ট থ্রী এইট ওয়ালথার পি.পি.কে-র বিরতিহীন বিস্ফোরণের আওয়াজে কাঁপছে আণ্ডারগ্রাউণ্ড শূটিং গ্যালারি। টেক্সচারড্ দেয়াল শুষে নিচ্ছে আওয়াজ, ফলে প্রতিধ্বনি উঠছে না, তবে হালকা ধোঁয়া ও করডাইটের গন্ধে একটু একটু করে ভারি হয়ে উঠছে বদ্ধ রূমটার পরিবেশ। পুরো এক ক্লিপ গুলি শেষ করে থামল মাসুদ রানা। ইয়ার প্রটেক্টর নামিয়ে ওপরে তাকাল। চার দেয়ালের চারটে বড় এগজস্ট ফ্যান টেনে বের করে দিচ্ছে কটুগন্ধি ধোঁয়া।

মাসুদ রানা যেখানে দাঁড়িয়ে, গ্যালারির সে অংশ পুরোপুরি অন্ধকার। ও প্রান্তে, যেখানে ওর টার্গেট, সেখানে আছে আলো। তবে এতই অল্প যে থাকা না থাকা দুইই সমান। জুতোর আওয়াজ শুনে সামনে তাকাল মাসুদ রানা। এগিয়ে আসছে বি.সি.আই-এর টেকো ইনস্ট্রাক্টর। আবছা আলোয় লোকটার মুখে হাসি দেখতে পেল ও। দু'হাতে হার্ডবোর্ডের তৈরি দুটো মানব-টার্গেটের কাঠামো ধরে আছে ইনস্ট্রাক্টর।

'অবিশ্বাস্য!' রানার সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা। হাসি আগের থেকে চওড়া হল আরও। 'এবারও হারিয়ে দিয়েছেন আপনি আমাকে। তবে আমি এখনও বেঁচে আছি, হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ছি, আর আপনি মরে গেছেন। এই যা সান্ত্বনা।'

মৃদু হাসি ফুটল মাসুদ রানার মুখে। কোন মন্তব্য না করে

পিছিয়ে এল ও, একটা ডেস্কের পাশে দাঁড়াল। হুড পরানো একটা টেবিল ল্যাম্প আছে ওটার ওপর, জ্বেলে দিল সেটা। টার্গেট দুটো ডেস্কের ওপর শুইয়ে দিল টেকো। 'এই দেখুন,' বলল সে। 'কিভাবে নিজের কলজে নিজে ছেঁদা করেছেন আপনি।'

দেখল মাসুদ রানা। ওর নিজের টার্গেটের বুকের বাঁ দিকটা, যেখানে কালো রঙে হার্ট আঁকা ছিল, প্রায় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে জায়গাটা চালনির মত। 'হার্ট তো গেছেই, স্টমাকের বাঁ দিকটাও খতম।' টাক চুলকাল ইনস্ট্রাক্টর। 'আমি তত ভাল করতে পারিনি।' নিজের টার্গেট দেখাল সে ইঙ্গিতে। 'হার্টে, স্টমাকে লাগাতে পেরেছি ঠিকই, তবে আপনার মত পারিনি। একটু দূরে দূরে লেগেছে।'

মুখ তুলল রানা টার্গেট থেকে। চোখে প্রশ্ন। দ্রুত মাথা দোলাল ইনস্ট্রাক্টর। 'ভাল। খুব ভাল করেছেন আপনি।'

ওয়ালথার হোলস্টারে পুরল মাসুদ রানা। 'চলি, কাল দেখা হবে আবার।'

'নিশ্চই, নিশ্চই!' ওর সঙ্গে বেজমেন্ট গ্যালারির সাউণ্ডপ্রুফ দরজা পর্যন্ত এল লোকটা। 'সম্ভব হলে কাল আরেকটু তাড়াতাড়ি আসবেন, রানা সাহেব। আরেকটু বেশি সময় দিলে ভাল হয়। আজকাল তো আপনার দেখা পাওয়াই মুশকিল।'

ঘুরে হ্যাণ্ডশেক করল রানা ইনস্ট্রাক্টরের সঙ্গে। 'চেষ্টা করব। স্লামালেকুম।'

'ওয়ালেকুম আসসালাম।' মাসুদ রানার প্রশস্ত পিঠে চোখ রেখে হাসিমুখে দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা। পুরো সত্যি কথা বলেনি সে রানাকে, চেপে গেছে। খুব ভালই নয় কেবল, সবচেয়ে ভাল ফল করেছে রানা টার্গেট প্র্যাকটিসে। বেশ অনেক দিন পর গ্যালারিতে এলেও আগের মতই নির্ভুল, অব্যর্থ-লক্ষ্য আছে মাসুদ

রানা। বরাবর যেমন ছিল। কিন্তু সে কথা ওকে বলা যাবে না। নিয়ম নেই। এ সব জানবেন কেবল বি.সি.আই কর্ণধার, মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান। আর কেউ নয়। ডেস্কের ড্রয়ার থেকে মাসুদ রানার স্কোর রেকর্ড ফাইল বের করল টেকো। ওর আজকের স্কোর তুলে রাখতে হবে।

একই জিনিস নির্ধারিত ফর্মে লিখে পৌঁছে দিতে হবে রেকর্ড সেকশনে। রাহাত খানের টেবিল ঘুরে দুপুরের আগেই জায়গামত পৌঁছে যাবে তার রিপোর্ট। কাজ শেষ করে ফাইলটা ড্রয়ারে রেখে তালা মেরে দিল ইনসট্রাক্টর। বেজমেন্ট থেকে গ্রাউণ্ড ফ্লোরের লিফট প্যাসেজে পৌঁছল মাসুদ রানা। ব্যস্ততম মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার এক দশ তলা ভবন এটা। এরই নয় তলার পুরোটা নিয়ে রয়েছে ন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানি ওরফে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের হেড অফিস। মোট চারটে লিফট আছে এ বিল্ডিঙে। তার একটার মাথায় ঝুলছে একটা নোটিসণ্ড রিজার্ভড ফর ন্যাশনাল ট্রেডিং এজেন্সি।

মৃদু শিস তুলে খুলে গেল লিফটের দরজা। ঢুকে পড়ল মাসুদ রানা। ওর গায়ে করডাইটের গন্ধ পেয়ে কুঁচকে উঠল লিফটম্যানের নাক। তবে এতে সে অভ্যস্ত। বেজমেন্ট থেকে সরাসরি যারা এসে লিফটে ওঠে, তাদের সবার গায়ে এ গন্ধ থাকে, জানে সে। দু'হাত ট্রাউজারের পকেটে ভরে লিফটের পিছন দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল মাসুদ রানা। ডান তর্জনী ঘুরিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে ওটার মাথা টিপছে ঘন ঘন। ব্যথা করছে আঙুলটা। কম নয়, পুরো পাঁচটা ক্লিপ শেষ করিয়েছে টেকো আজ ওকে দিয়ে। অনেক দিন পর গ্যালারিতে যাওয়ার শাস্তি।

ফলাফল সম্পর্কে টেকোর মন্তব্যে মাসুদ রানা সন্তুষ্ট। কিন্তু তা নিয়ে অহঙ্কার নেই ওর মনে। তবে গ্যালারির আলো আরেকটু

বেশি হলে ফলাফল হয়তো আরও ভাল হত, ভাবল মাসুদ রানা। কিন্তু রাহাত খানের তাতে ঘোর আপত্তি। তাঁর ধারণা, পরিষ্কার আলোয় টার্গেট ভেদ করা কোন কাজের কাজ নয়। কাজের কাজ হচ্ছে অন্ধকারে সফল হওয়া। কাজেই সেভাবেই চলে বি.সি.আই-এর শূটিং গ্যালারি।

নয় তলায় পা রেখেই মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল মাসুদ রানার। গত দু'মাস ধরে ডেস্ক ওয়ার্ক করতে করতে যাযাবর মনটা হাঁপিয়ে উঠেছে ওর। নিয়মিত নয়টা-পাঁচটা ফাইলের মধ্যে লাঙল চষা অসহ্য হয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি যদি এই রুটিন থেকে মুক্তি না জোটে, দম বন্ধ হয়ে মরেই যাবে মাসুদ রানা। মাঝেমধ্যে ভাবে ও, এখনই এই অবস্থা! কয়েক বছর পর যখন ফিল্ড থেকে অবসর নিতে হবে, বাধ্যতামূলক অফিস ডিউটিতে যোগ দিতে হবে, তখন কি হবে?

নিজের অফিস রুমে ঢুকল মাসুদ রানা। ঢুকতেই ডান পাশে সুন্দর সাজানো-গোছানো ফ্রন্ট অফিস। রানার সুন্দরী ব্যক্তিগত সচিবের অফিস। ওকে দেখে মধুর হাসি উপহার দিল মেয়েটি। পরক্ষণেই হোঁচট খেলো তার হাসি, মাধুর্য দশ ডিগ্রী নেমে গেল। 'দাঁড়াও দাঁড়াও! কোটটা খুলতে দাও,' এগিয়ে এল সে সারা অঙ্গে ঢেউ তুলে। 'কি বিচ্ছিরি গন্ধ! এ মা!'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোটটা হ্যাঙ্গারে ঝোলানো দেখল তার মাসুদ রানা। 'কোন জরুরী খবর-টবর আছে আজ?'

মাথা দোলাল মেয়েটি হতাশ চেহারা করে। 'নেই। তবে ফাইল আছে একগাদা, রেখে এসেছি সব তোমার টেবিলে।'

'যন্ত্রণা!' গজ গজ করে উঠল মাসুদ রানা। পা বাড়াল নিজের রুমের দিকে। 'চাকরি এবার ছেড়েই দিতে হবে দেখছি!'

'কফি?' হাসি চাপল মেয়েটি।

'হ্যাঁ, দাও।'

নিজের ডেস্কে এসে বসল মাসুদ রানা। বাঁ দিকে পাহাড় হয়ে আছে বাদামী ফোল্ডারের। প্রত্যেকটির ওপরে আঁকা লাল জাতীয় প্রতীক। নিচে লেখাগু টপ সিক্রেট। বিরক্ত চেহারায় ওপরের ফোল্ডারটা খুলল রানা। একটা ডানহিল ধরিয়ে মন দিল ওতে। প্রথমেই বড়সড় একটা ডিটেইলড ম্যাপের ওপর চোখ পড়ল মাসুদ রানার, দক্ষিণ পোল্যাণ্ড ও উত্তর-পুব জার্মানির। ওয়ারশ ও বার্লিনের মধ্যেকার একটা রুট লাল কালি দিয়ে আঁকা আছে ম্যাপটায়। তার ওপর লেখাগু মেইনলাইনগু ওয়েল এস্টাবলিশড্ এস্কেপ রুট ফ্রম ইস্ট টু ওয়েস্ট।

ম্যাপের সঙ্গে স্ট্যাপল করা আছে একটা টাইপ করা মেমোরেণ্ডাম। তার শুরুতেই লেখা 'ফর ইনফরমেশন ওনলি'। দ্রুত মেমোরেণ্ডামে চোখ বুলিয়ে গেল মাসুদ রানা। ওটা শেষ হওয়ার আগে অ্যাশট্রেতে চারটা ফিল্টার টিপ জমা হলো। ইনফরমেশনগুলো গলাধঃকরণ করে পরবর্তী ফাইল টেনে নিল রানা। ন্যাটোর রেডিও ইন্টেলিজেন্স ডিভিশনের 'রেডিও সিগনেচার' বিষয়ক ফাইল এটা, কপালে যথারীতি জ্বলজ্বল করছে 'ফর ইনফরমেশন ওনলি'।

চার আঙুল দিয়ে নিজের কপালে একটা চাঁটি মারল মাসুদ রানা। 'হায় খোদা! আর কত ইনফরমেশন হজম করতে হবে? এইসব ছাইপাঁশ...' থেমে পড়ল ও টেলিফোনের মৃদু কির কির আওয়াজ শুনে। ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল রানা। ওর ডেস্কে তিনটে টেলিফোন সেট, তিন রঙের। কালোটা বাইরের জন্যে, সাদাটা ভেতরের। এবং শেষের লাল রঙেরটা সরাসরি রাহাত খানের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। স্ক্র্যাম্বলার সংযুক্ত। ওটাই বাজছে।

রিসিভার লক্ষ্য করে থাবা চালাল মাসুদ রানা। 'ইয়েস!'

‘তুমি কি ব্যস্ত?’ ওপ্রান্ত থেকে প্রশ্ন করল মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের পি.এ. মেয়েটি।

‘একশোবার! রোজ এত এত ইনফর্মেশন পাঠাচ্ছ, ওগুলো মুখস্থ করতে হয় না?’ বিরক্ত কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

ওপ্রান্তে সুরেলা হাসির আওয়াজ উঠল।

‘বোকার মত হি হি কোরো না তো! মুডটা নষ্ট করে দিয়ো না। কি প্রয়োজনে ফোন করেছ অধমকে, জানিয়ে কৃতার্থ করো। তাড়াতাড়ি!’

‘মনে হয় অবশেষে শিঁকে ছিঁড়ল তোমার ভাগ্যে।’

‘মানে? ডাক পড়েছে?’

‘হ্যাঁ। বিশেষ ব্যস্ততা না থাকলে চেম্বারে আসতে বলেছেন বস্।’

কিছুটা হতাশ হলো মাসুদ রানা। শুনে মনে হচ্ছে তেমন বিশেষ কিছু নয়। আবার অকাজে, কেবল খোশগল্প করতে ওকে ডেকেছেন বৃদ্ধ, তা-ও নিশ্চয়ই নয়। কি হতে পারে? ‘আমি আসছি।’ রিসিভার রেখে দিল মাসুদ রানা। ফোল্ডার বন্ধ করে চেয়ার ছাড়ল।

ও যখন রূমে ঢুকল, রাহাত খান তখন পাইপ ধরাবার কাজে ব্যস্ত। ওরই ফাঁকে চোখ তুলে রানাকে দেখলেন, জ্বলন্ত লাইটার ধরা হাতের আবছা ইঙ্গিতে বসতে বললেন ওকে। নির্দেশটা নীরবে পালন করল মাসুদ রানা। ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানাকে দেখলেন বৃদ্ধ, ‘ঠুক্’ শব্দে লাইটারটা রাখলেন গ্লাসটপ্ ডেস্কের ওপর।

‘তারপর? কেমন চলছে তোমার, মাসুদ রানা?’

বিস্মিত হলো রানা খানিকটা। রাহাত খানের মুখে শুধু ‘রানা’ শুনেই অভ্যস্ত ও, পুরোটা নয়। এ ধরনের ব্যাপার মাঝেমধ্যে ঘটে

অবশ্য, যখন ভেতরে ভেতরে কোন বিষয় নিয়ে খুব বিচলিত থাকেন রাহাত খান, উদ্বিগ্ন থাকেন, কি করতে হবে ভেবে না পান, তখন। তা-ও খুবই কম। 'কোনরকম, স্যার। রুটিন ওয়ার্ক করতে করতে হাঁপ ধরে গেছে।'

'বুঝতে পারছি,' মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'একঘেয়ে কাজ, বিরক্তি লাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু কি আর করা, ওটাও তো কম গুরুত্বপূর্ণ নয়!'

ভাল মানুষের মত মুখ করে বলল ও, 'জ্বি, স্যার।'

নীরবতা নেমে এল ঘরের মধ্যে। টানা ভুলে পাইপের বাউল পরীক্ষা করতে লাগলেন রাহাত খান মন দিয়ে। নিচের রাজপথ থেকে গাড়িঘোড়ার ছোটাছুটি, রিকশার বেল, হকারদের হাঁকডাক ভেসে আসছে। জানালা ঘেঁষে ফড় ফড় ডানার আওয়াজ তুলে উড়ে গেল একটা কাক। ধারেকাছেই কোথাও পটকা ফোটার বিকট আওয়াজ উঠল একটা।

সামনের বহু পোড়খাওয়া মুখটার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা আন্দাজ করার চেষ্টা করল মাসুদ রানা। কি হতে পারে ব্যাপারটা? কেন ডেকেছেন ওকে বৃদ্ধ? অফিশিয়াল কিছু যে নয়, সে ব্যাপারে রানা একশো ভাগ নিশ্চিত। হলে এতক্ষণে অবশ্যই শুরু করে দিতেন রাহাত খান। তার মানে কি ব্যক্তিগত কিছু? কোন ব্যক্তিগত সমস্যায় পড়েছেন বৃদ্ধ? বা তাঁর কোন ঘনিষ্ঠজন? হঠাৎ মনে হলো রানার, বিব্রত বোধ করছেন রাহাত খান। বোধহয় ভেবে পাচ্ছেন না কি ভাবে শুরু করবেন, বা কোত্থেকে শুরু করবেন। ইচ্ছে হলো বৃদ্ধকে সাহায্য করে ও এ ব্যাপারে। কিন্তু বিষয়টা কি নিয়ে, তাই তো ছাই জানে না রানা। যদি বোঝা যেত...বৃদ্ধের খুক্ খুক্ কাশির শব্দে চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল ওর। বৃদ্ধের অন্যমনস্কতার সুযোগে নিভে গেছে পাইপ কখন যেন।

আবার ওটা ধরিয়ে নিলেন তিনি। 'হাতে তাহলে তেমন কোন কাজ নেই তোমার, তাই না?'

'না, স্যার,' সুযোগটা লুফে নিল মাসুদ রানা। 'তেমন কোন কাজ নেই। কোন সমস্যা হয়ে থাকলে... ।' লাইনটা ধরিয়ে দিয়ে থেমে গেল ও। কাজ হলো। রানা জানত হবে। গলতে শুরু করল বরফ।

'হ্যাঁ, কঠিন একটা সমস্যায় পড়েছি, রানা। কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, অফিশিয়াল কিছু নয়। ভাবলাম, তুমি সাহায্য করলে এর একটা সুরাহা হয়।'

'নিশ্চই, স্যার। বলুন, সমস্যাটা কি?'

রাহাত খানের চেহারা দেখে মনে হলো যেন সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছেন। অফিসের কাউকে কোন ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দিলে এমনিই হয় তাঁর চেহারা। কঠোর নীতি পরায়ণ বৃদ্ধ মনে করেন এসব তাঁর অনধিকার চর্চা। নিতান্ত দায় না ঠেকলে এ কাজ করেন না রাহাত খান। কিছু সময় এক মনে পাইপ টানলেন তিনি, তারপর মুখ খুললেন। 'ইরাকের কুয়েত অভিযানের সপ্তাখানেক আগে এক রাতে, পারস্য উপসাগরে এক কুয়েতি ধনকুবের শেখকে খুবই নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। জানো কিছু এ ব্যাপারে?'

'ঘটনাটা মনে হয় শুনেছিলাম, স্যার,' অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'তবে বিস্তারিত জানি না।'

আনমনা হয়ে পড়লেন রাহাত খান। 'ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখজনক, রানা। নিহত শেখ জাবের আল উবায়েদ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ছিলেন। কুয়েতি সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার ছিলেন তিনি। একসঙ্গে ব্রিটেনের রয়্যাল মিলিটারি

অ্যাকাডেমিতে ট্রেনিং নিয়েছি আমরা। শুধু ট্রেনিংই নয়, অ্যাকাডেমির হোস্টেলে একই রূমে থেকেছি দু'জন। মৃত্যুর সময় অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক ছিলেন উবায়েদ। আত্মীয় বলতে ছিল কেবল এক নাতনী, নিউ ইয়র্কে পড়াশুনা করে মেয়েটি। নাম নাদিরা। এ ছাড়া ত্রিভুবনে আর কেউ ছিল না উবায়েদের। বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান ছিলেন ভদ্রলোক।'

'তারপর?'

'অদ্ভুত এক শখ ছিল ভদ্রলোকের। দুনিয়ার যেখানে যত মূল্যবান হীরে-জহরৎ মণি-মুক্তার নিলাম হত, সেখানেই গিয়ে হাজির হতেন তিনি। সর্বোচ্চ দর হেঁকে কিনে নিয়ে আসতেন সব। দামী দামী অলঙ্কারও কিনতেন। অল্প বয়স থেকেই এ শখ এক-আধটু ছিল উবায়েদের, পরে পিতার মৃত্যুর পর তাঁর যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, ব্যবসা ইত্যাদির মালিক বনে যেতে তা আরও বেড়ে যায়। ব্যাপারটা এক সময় ম্যানিয়া হয়ে দাঁড়ায় উবায়েদের। তাঁর স্ত্রীকে অনেকেই আক্ষেপ করে বলতে শুনেছে, উবায়েদ আমার থেকে তার রত্ন ভাণ্ডারকে বেশি ভালবাসে। আসল কথা তাঁর দিন-রাতের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল ওগুলো। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছেন তিনি ওর পিছনে। এ বিষয়ে উবায়েদ ছিলেন পৃথিবীর সেরা।'

হঠাৎ পাইপের ওপর বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলেন রাহাত খান। কাঁচের অ্যাশট্রেতে ঠুকে ঠুকে ফেলে দিলেন পোড়া তামাকটুকু। ওটা মুঠোয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

'এরপর, ইরাক কুয়েত আক্রমণ করতে যাচ্ছে শুনে ঘাবড়ে যান উবায়েদ। সে সময়ে ব্রিটিশ এমবাসির ফার্স্ট সেক্রেটারি ছিলেন উইলিয়াম ড্র্যাক্স, তার মুখেই এ সম্ভাবনার কথা জানতে পারেন তিনি। শুনে ভীষণ ঘাবড়ে যান উবায়েদ। দিশে না পেয়ে

তাকেই ধরে বসেন নিজেকে এবং তার ভাণ্ডার রক্ষা করার একটা উপায় বের করে দিতে। ওই সময় কুয়েতের বন্দরে একটা ব্রিটিশ ফ্রেইটার ছিল। উপায় না দেখে খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে ওতেই উবায়েদকে তুলে দেন ড্র্যাক্স, তাঁর কালেকশনসহ। ইরাকী আগ্রাসনের ছয়দিন আগে সেই ফ্রেইটার, লোট্টি ও মারা ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে কুয়েত ত্যাগ করে। তারপর অনেকদিন পর্যন্ত কোন খবর ছিল না জাহাজটার।

'যা হোক, পরে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় আমেরিকান এক গানশীপ জাহাজটিকে উদ্ধার করে টেনে নিয়ে যায় সৌদী আরবে। পরিত্যক্ত অবস্থায় ভাসছিল ওটা ওমান উপসাগরে।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'ঘটনাটা পড়েছিলাম পত্রিকায়।'

'উবায়েদকে তাঁর কেবিনে মৃত পাওয়া যায়। জাহাজের অন্যরা, ক্যাপ্টেন থেকে সাধারণ ডেকহ্যান্ড পর্যন্ত সবাইকে কুকুরের মত গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। মৃতদেহগুলো পচে গলে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তবু সৌদী সরকার ওগুলোর ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করে। জানা যায়, বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে উবায়েদকে। আর, বাদবাকিদের কথা তো আগেই বললাম। বড় তিনটে অ্যাটাশে ছিল উবায়েদের সঙ্গে, তাঁর কালেকশন বোঝাই।'

'নিশ্চই পাওয়া যায়নি ওগুলো?'

'ঠিক তাই। যুদ্ধের উত্তেজনায় কিছুদিন চাপা পড়ে ছিল ব্যাপারটা। পরে ঘটনার তদন্তভার ইন্টারপোলের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারেনি ওরা। এগোবার মত সূত্র ছিল না। ছয় মাসের মধ্যে কেস ড্রপ্ করে ওরা। দু'বছরের বেশি চাপা পড়ে ছিল ব্যাপারটা, সবাই প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু...উবায়েদের একমাত্র নাতনী, নাদিরা, নিউ ইয়র্কে পড়াশুনা

করে বলেছি, মাস দেড়েক আগে ওখানকার বড় এক অলঙ্কার বিক্রেতার দোকানে মেয়েটি নানার খুব মূল্যবান কয়েক সেট অলঙ্কার দেখতে পেয়েছে। ওদের শো-কেসে সাজানো।'

বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। 'ওগুলো চিনল কি করে নাদিরা?'

'নিজের প্রতিটি সংগ্রহের পিছনে বিশেষ এক ধরনের কালি দিয়ে সীল মারা আছে উবায়েদের।'

'সে কি! এখনও সে সীল রেখে দেয়া হয়েছে?'

'ঠিক সীল না। সীল যেখানে যেখানে ছিল, সে সব জায়গায় হালকা ঘষার দাগ আছে। ওই দাগ দেখে চিনেছে সে। তুলে ফেলেছে ওরা সীলের চিহ্ন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। ভাবছে। 'কোন ভুল হয়নি তো নাদিরার?'

না। নানার প্রায় প্রত্যেকটি সংগ্রহ চেনা আছে তার। এ বিষয়ে নানার মত বাতিক না থাকলেও আগ্রহ আছে নাদিরার। শুনে অবশ্য প্রথমে আমারও সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু গোপনে খোঁজ নিয়েছি আমি। প্রমাণ পেয়েছি ওর দাবি সঠিক।'

'দোকানটার মালিক কে?'

'ওখানকার খুব প্রভাবশালী এক মাফিয়া ডনের ছেলে, রবার্টো গার্সিয়ার।'

চিন্তিত মুখে থুতনি ঘষল মাসুদ রানা। 'মাফিয়া এমন কাঁচা কাজ করবে কেন? নিজেদেরই যখন অলঙ্কার বিক্রির ব্যবসা, নিশ্চই ওসব তৈরিও করে ওরা। তাহলে লুটের মাল, বিশেষ করে অলঙ্কারগুলো ভেঙে সহজেই তো নতুন করে তৈরি করতে পারে। ঘষাঘষির কি প্রয়োজন? যে কোন সময় সন্দেহ...'

'ব্যাপারটা আসলে সেরকম নয়, রানা। সীলগুলো ওরা তুলেছে যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে। খুব ভাল করে লক্ষ না করলে দেখা

যায় না ঘষার দাগ। তাছাড়া, ওগুলো ভাঙার দরকারটাই বা কি? আমরা ধরে নিতে পারি এ লাইন সম্পর্কে যাদের আগ্রহ একেবারেই নেই, পত্র-পত্রিকার কল্যাণে তারাও উবায়েদকে ভাল করে চেনে তাঁর বিশেষত্বের কারণে। গার্সিয়া তো লাইনের মানুষ। সে নিশ্চই আরও বেশি চেনে। জানে উবায়েদের তেমন কেউ নেই, যে ওগুলো আবিষ্কার করতে পারে। ঝামেলায় ফেলে দিতে পারে তাকে। আর কেউ যদি সে চেষ্টা করেও বসে, তাতেই বা কি? পুলিসী ঝামেলা হবে? পুলিস একটা আঙুলও তুলবে না গার্সিয়ার মত লোকের বিরুদ্ধে, তুমি জানো। বড়জোর কিছু পয়সা খাবে ওরা, তারপর উল্টে গার্সিয়াকেই প্রটেকশন দেবে। তাও যদি সম্ভব না হয়, সময়মত তাকে সতর্ক করে দেবে। সব মাল সরিয়ে ফেলবে গার্সিয়া, প্রয়োজনে তখন সে ওগুলো ভেঙে নতুন করে বানাবার চিন্তা করবে। তার আগে কেন তা করতে যাবে শুধু শুধু?'

ঠিকই বলেছেন রাহাত খান, ভাবল মাসুদ রানা।

'শুধু পুলিস কেন, লোকটার বিরুদ্ধে যায় এমন কিছু এফবিআইও করবে না, রানা। কেউ-ই এখন পারতপক্ষে ঘাঁটায় না মাফিয়াকে, অন্তত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাজনিত কিছু না হলে।'

'এ ঘটনা আপনি কি করে জানলেন, স্যার?'

'নাদিরার একটা চিঠি পেয়েছি, তা ধরো, মাসখানেক আগে। খুব ছোট থাকতে দু'য়েকবার দেখেছি ওকে আমি। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তবে উবায়েদ নিশ্চই ওকে আমার কথা বলে থাকবেন। চিঠিতে জানলাম, মেয়েটি আমার পেশা সম্পর্কেও জানে। পুরোটা বিস্তারিত জানিয়েছে নাদিরা। জানতে চেয়েছে এ ব্যাপারে আমার পক্ষে ওকে কোন সাহায্য করা সম্ভব কি না।'

'বিষয়টা ওদেশের পুলিসকে জানিয়েছে নাদিরা?'

'না। কাউকেই কিছু বলেনি ও আমাকে ছাড়া। চিঠি পাওয়ার পর লোক মারফত যোগাযোগ করেছি আমি নাদিরার সঙ্গে। অবশ্য আমি,' আনমনে পাইপ দিয়ে ঠুক্ ঠুক্ শব্দে টেবিল ঠুকতে লাগলেন বৃদ্ধ, 'প্রসঙ্গটা আকারে ইঙ্গিতে এফবিআই চীফকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু স্রেফ পাশ কাটিয়ে গেল সে।'

কপাল কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার। 'কারণ?'

তর্জনী দিয়ে ডান চোখের কোণ চুলকালেন বৃদ্ধ। 'তার যুক্তি হচ্ছে, হারলেম নিয়ে ব্যস্ত ওরা, এ সময়ে মাফিয়াকে ঘাঁটানো ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। এদিকে কবে ওদের সুযোগ হবে, সে আশায় বসে থাকাও যায় না। নাদিরার ধারণা, এরই মধ্যে বেশ কিছু গহনা-পাথর বিক্রি করে দিয়েছে গার্সিয়া।'

'আপনি কি নাদিরার নাম উল্লেখ করেছিলেন এফ.বি.আই চীফের সামনে?'

কটমট করে তাকালেন রাহাত খান। ভাবখানা, তুমি কি পাগল মনে করো আমাকে? 'প্রশ্নই আসে না।'

কিছু সময় চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। 'আপনি যদি বলেন, আমি যেতে পারি নিউ ইয়র্ক। স্রেফ পথে বসিয়ে দিয়ে আসতে পারি ডনের বাচ্চাকে।'

'কিন্তু একটা সমস্যা আছে, রানা।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল ও।

'তোমাকে অফিশিয়ালি কোন সাহায্য করতে পারব না আমি এ ব্যাপারে। অসুবিধে আছে। যা করার ব্যক্তিগতভাবে করতে হবে তোমার। এবং অবশ্যই আনঅফিশিয়ালি হতে হবে পুরোটা। তোমার এজেন্সির ছেলেদের সাহায্য নিতে পারবে প্রয়োজনে, তবে ফাইল ওপেন করা চলবে না। বি.সি.আই. তো নয়-ই, রানা এজেন্সিও যুক্ত হতে পারবে না এর সঙ্গে।'

আনমনে কয়েক মুহূর্ত কার্পেটটি দেখল রানা। তারপর মুখ তুলল। 'ঠিক আছে, স্যার। আনঅফিশিয়ালি-ই ঘটবে সব।' একটু ভাবল ও। 'জাহাজ আক্রমণের সময় গার্সিয়া উপস্থিত ছিল?'

'হ্যাঁ। ওই ঘটনার মাত্র কয়েকদিন আগে ডুসেলডর্ফের বড় এক নিলামে অংশ নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন শেখ। এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখেন তাঁর বহুদিনের পুরানো, বিশ্বস্ত শোফারের বদলে অচেনা একজন গাড়ি নিয়ে এসেছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করলে সে জানায়, তাঁর শোফার হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার বদলে আপাতত কিছুদিন সে কাজ করবে। দায়িত্বটা উবায়েদের শোফারই তাকে দিয়েছে। সে তার আত্মীয়। শেখের বাড়ির অন্য কাজের লোকেদের দেয়া চেহারার বর্ণনা অনুযায়ী দেখা গেছে, নতুন শোফারটি গার্সিয়া ছাড়া আর কেউ নয়। উবায়েদের দুর্ভাগ্য যে তাঁর ড্রাইভারটি ছিল ইটালিয়ান।'

'অর্থাৎ আগে থেকেই তাঁর পিছনে লেগে ছিল গার্সিয়া?'

'নিশ্চই! হয়তো অন্য কোন উপায়ে শেখের সংগ্রহ আত্মসাৎ করার ধান্ধায় ছিল লোকটা। হঠাৎ করে রাজনৈতিক হাওয়া বদলে গিয়ে কাজটা সহজ করে দিয়েছে তার।'

'সেই অসুস্থ শোফার কোথায়?'

'যেদিন লোট্টি ও মারা রওনা হয়, তার তিনদিন আগেই মারা গেছে। গুলি করে হত্যা করা হয়েছে তাকেও।' আবার নতুন করে পাইপে তামাক ভরলেন রাহাত খান। 'বিষয়টা যুদ্ধের কারণে তেমন প্রচার পায়নি প্রথমে। পরে অবশ্য পত্রপত্রিকা এ নিয়ে লেখালেখি করেছে। তবে কাজের কাজ কিছু হয়নি।'

'ক্লিক্' শব্দে জ্বলে উঠল বৃদ্ধের লাইটার। পাইপ ধরিয়ে আনমনে কিছুক্ষণ ধোঁয়া গিললেন তিনি। 'দেশে ফিরে নাদিরা এ

নিয়ে সরকারের উঁচু মহলে দেন দরবার করেছে সাধ্যমত। কুয়েত সরকার শেখ উবায়েদের পুরানো শোফারের দেশের ঠিকানা ইটালিয়ান সরকারকে জানিয়ে তার আত্মীয়টির খোঁজ বের করার অনুরোধও জানিয়েছিল। কিন্তু কোন রহস্যময় কারণে তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছে রোম কয়েক পা এগিয়েই।'

আনমনে মাথা দোলালেন রাহাত খান। 'গার্সিয়ার গোড়া খুব শক্ত, বোঝাই যায়। কাজেই ভুলেও আণ্ডার-এস্টিমেট করবে না ওকে। ভাল করে আটঘাট বেঁধে তবে মাঠে নামবে।'

'জ্বি।'

'অফিসে থেকো। কিছুক্ষণের মধ্যে নাদিরা আসছে, ওর সাথে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেব।'

'নাদিরা!' বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। 'ও এখানে, মানে ঢাকায়?'

মুচকে হাসলেন রাহাত খান। 'আমার বাসায় আছে ও। তিনদিন আগে এসেছে।'

তিন

নিউ ইয়র্ক।

ওয়েস্ট এইটিসেভেনথ স্ট্রীট। সকাল এগারোটা। একটি ট্যাক্সিক্যাব এসে দাঁড়াল পেভমেন্ট ঘেঁষে। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘদেহী এক যুবক। চোখা চেহারা। গাল দুটো সামান্য চাপা। মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল, সিঁথি করে আঁচড়ানো। নাকের নিচে চওড়া গোঁফ। বাঁ গালে বড় একটা লাল আঁচিল। চোখ দেখলে নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর মনে হয় যুবককে। ক্রীম রঙের ট্রাউজার ও

টকটকে লাল স্পোর্টস শার্টে দারুণ লাগছে। মাসুদ রানা তার নাম। কাঁধে ছোট একটা ট্র্যাভেলিং ব্যাগ ঝুলছে ওর।

ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিল রানা। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকাল, মনে হলো কিছু খুঁজছে। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে এ-গলি ও-গলি করে বেড়াল ও। অবশেষে ব্রডওয়ে এবং ওয়েস্ট এণ্ডের মাঝামাঝি ওয়েস্ট নাইনটি ফোর্থ স্ট্রীটে পেয়ে গেল যা খুঁজছিল। বড় রাস্তা থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছে বেশ পুরানো একটা চোদ্দ তলা ভবন। হোটেল। হোটেল হার্ডিং।

ভেতরে ঢোকার মুখে দেয়ালে ছোট করে লেখা হোটেলের নামটা কোন এককালে নিশ্চয়ই তাই ছিল। এখন অন্য রকম হয়ে গেছে। শেষের আইএনজি তুলে ছোট্ট একটা ড্যাস দিয়ে ওএন লিখে রেখেছে কে যেন। হবে হয়তো দুষ্ট ছেলেপিলের কাজ। দেখলে বোঝা যায় অতীতে ভালই চলত হার্ডিং ওরফে হার্ড-অন। দৃঢ় পায়ে লবিতে এসে ঢুকল মাসুদ রানা। ভেতরের নানান তরল ও কঠিন পদার্থের মিলিত দুর্গন্ধে মুহূর্তে চোখে পানি এসে গেল ওর। অতিথিদের জন্যে লবিতে একটা চেয়ারও রাখা নেই। আছে কেবল কলম্বাস আমলের একটা লম্বা ডেস্ক, তার পিছনে একটা চেয়ার, এবং পাখির খাঁচার মত একটা খাঁচা, যা দেখে মাসুদ রানাকে অনেক কষ্টে বুঝে নিতে হলো ওটা আসলে এলিভেটর। সেলফ সার্ভিস এলিভেটর।

ডেস্কের ওপাশে বসা মানুষটির দিকে নজর দিল মাসুদ রানা। জীবন্ত এক কঙ্কাল যেন। কাগজের মত পাতলা চামড়া লেপটে আছে হাড়ের সঙ্গে। এত শুকনো মানুষ জীবনে এই প্রথম দেখল ও। ঘাড় নিচু করে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে লোকটা। এমনভাবে গ্লাসটা ধরেছে সে, দেখলে মনে হয় জিনিসটার ওজন মনখানেক হবে।

রানার প্রশ্নের উত্তরে আশ্চর্যরকম চড়া কণ্ঠে আউড়ে গেল জিন্দা লাশ, 'ফাইভ আ ডে, থার্টি আ উইক, আ হাণ্ড্রেড আ মানথ। থার্টি শোনাল, 'থোয়িটি', হাণ্ড্রেড 'আনডার্ট' আর মানথ 'মানট'।

'অ্যাটাচড্ বাথ হতে হবে কিন্তু।'

কাঁচা চিবিয়ে খাওয়ার দৃষ্টিতে মাসুদ রানাকে দেখল মানুষটা। 'সে কথা আগে বলতে বেধেছিল কোথায়? সাত ডলার রোজ, হাপ্তা চল্লিশ, মাস একশো ত্রিশ, চলবে?'

'রুমটা দেখতে চাই।'

পিছনের দেয়ালে ঝোলানো হুক বোর্ড থেকে একটা চাবি খসিয়ে নিল জিন্দালাশ, কাউন্টারের ওপর দিয়ে জোর এক ঠেলায় পাঠিয়ে দিল রানার দিকে। সময় মত রানা ক্যাচ না ধরলে নির্ঘাত লবির মাঝ পর্যন্ত উড়ে যেত চাবি। 'রুম সাতশো তিন। ক্রস ভেন্টিলেশন। ধোয়া চাদর আর তোয়ালে সরবরাহ করা হবে প্রতি হপ্তায় একবার করে।'

কাউন্টারে কনুইয়ের ভর চাপিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল মাসুদ রানা। একটু আগে মহাশূন্য অভিযানে গেছে এলিভেটর, ওটার সফল প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায়। এক সময় নামল ওটা, দুরু দুরু বুকে পায়ে পায়ে এগোল রানা। অস্ফুটে দোয়া-দরূদ পড়ছে। নানা রকম অশ্রুতপূর্ব কাতর ধ্বনি, সামনে-পিছনে দোল আর ক্রমাগত ঝাঁকি খেতে খেতে ওকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল খাঁচা।

তিন তলা অতিক্রম করার সময় করিডর দিয়ে ভেসে আসা নারীকণ্ঠের বিকট এক চিৎকার শুনে চমকে উঠল মাসুদ রানা। মনে হলো নিশ্চয়ই কেউ ছুরি মেরেছে মেয়েটিকে, নয়তো তার প্রসব বেদনা উঠেছে। পাঁচ তলায় ফুল ভল্যুম দিয়ে অ্যাসিড রক শুনছে কেউ সিডি প্লেয়ারে। এত প্রচণ্ড আওয়াজ উঠছে ড্রাম

বিটের যে শক্ ওয়েভের ঠেলায় খাঁচার কাঁপাকাঁপি আরও বেড়ে গেল।

সাতশো তিন নম্বর রূমটা সাত তলার করিডরের একেবারে পুব মাথায়। আয়তন পনেরো স্কয়ার ফুট। সিঙ্গল খাট, ড্রেসিং টেবিল, একটা গদিমোড়া আর্মচেয়ার। একটা খুদে নড়বড়ে রাইটিং টেবিল, সঙ্গে কাঠের চেয়ার এবং একটা ক্লজিট, এই হলো আসবাব এ রূমের। বিছানায় চাদর নেই, চিমসে মার্কা ম্যাট্রেস যেটা আছে, নিচের জিন্দালাশের মতই প্রায় স্বাস্থ্য তার। আয়নায় চেহারা দেখা দুষ্কর, অসংখ্যবার রং করার ফলে বাথরূমের দরজা এত পুরু হয়ে গেছে যে সর্বশক্তি ব্যয় করেও লাগানো যায় না। কমোড, ওয়াশ বেসিন ইত্যাদির অবস্থা অবর্ণনীয়।

চার দেয়ালে মাকড়সার জালের মত ফাটল। খাবলা খাবলা চলটা উঠে গেছে রঙের। পায়ের তলায় কার্পেট আছে ঠিকই, তবে ওপরদিকের লোম প্রায় উজাড়। সর্বত্র দাঁত বের হয়ে আছে বাদামী রঙের চটের ব্যাকিং। অসহায়ের মত এদিক ওদিক তাকাল মাসুদ রানা। এত দুঃখও ছিল কপালে! নিচে নেমে এল ও।

'রূমটা নিচ্ছি আমি।'

'কতদিনের জন্যে?'

'ঠিক নেই। এক হপ্তা, এক মাস বা এক বছর,' কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'আগে থেকে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই।'

গভীর সন্দেহ ফুটল জিন্দালাশের কোটরাগত কুতকুতে চোখে। 'কি করা হয়?' গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে।

'পকেট কাটা হয়।' রানাও গম্ভীর।

'পুলিসী ঝামেলার কোন আশঙ্কা আছে?'

'পাগল! আমি পুলিসের বাবা! বারো বছর পকেট কাটছি, ধরা

পড়িনি একদিনও। পড়বও না।'

'ভাল। এক হপ্তার ভাড়া অগ্রিম দিতে হবে।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে পকেটে হাত ভরে দিল মাসুদ রানা।

'মেয়ে নিয়ে রাত কাটানো যাবে না। জোরে জোরে গান-বাজনা শোনা নিষেধ। পার্টি দেয়া চলবে না। ড্রাগস, হার্ড বা পট স্মোকিং, কোনটাই চলবে না।' আরেক দিকে তাকিয়ে রীডিং পড়ে গেল লোকটা।

'আমি রাজি।' গুণে গুণে চল্লিশ ডলার বের করে দিল মাসুদ রানা। মানি রিসিট চাইল। আবার কাঁচা চিবিয়ে খাওয়ার চাউনি দিল জিন্দালাশ। ও-ও পাল্টা চোখ দেখাল এবার। ফলে ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও দু'মিনিট পর একটা রসিদ ধরিয়ে দিল লোকটা রানার হাতে। হার্ড-অনের রেজিস্ট্রেশন কার্ডে সই করল রানা। নাম লিখল প্যাট্রিক কার্নি।

বেরিয়ে এল ও হোটেল ছেড়ে। ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলো হাইওয়ে সুপার মার্কেট। সেখান থেকে দুই ক্যান অ্যারোসল, র‍্যাট রিপেলেন্ট পাউডার, সাবান-শ্যাম্পু, চাদর-তোয়ালে, এক হালি করে শার্ট-প্যান্ট, আণ্ডারওয়্যারসহ টুকিটাকি আরও অনেক কিছু কিনল মাসুদ রানা। দুপুর গড়িয়ে যেতে বসেছে ততক্ষণে। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। কিন্তু ব্যাপারটাকে পাত্তা দিল না ও। ফিরে এল হোটেলে।

প্রায় এক ঘণ্টা খরচ করে রূমটাকে মোটামুটি বাসযোগ্য করে তুলল মাসুদ রানা। সারা ঘরে, বাথরূমে অকৃপণ হাতে অ্যারোসল স্প্রে করল। দরজার সামনে ছড়িয়ে রাখল বেশ খানিকটা র‍্যাট রিপেলেন্ট। যদিও এ পর্যন্ত ইঁদুর চোখে পড়েনি, কিন্তু ওর বদ্ধমূল ধারণা, এত সুন্দর উপযুক্ত জায়গায় ইঁদুর না থেকেই পারে না। কাজ সেরে আচ্ছাসে সাবান-শ্যাম্পু মেখে গোসল করল সে।

তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল পেট ঠাণ্ডা করতে। ব্রডওয়ের এক পরিচিত রেস্টুরেন্টে খাওয়ার পাট চুকাল ও। তারপর এক কাপ কফি নিয়ে ভাবতে বসল।

তিনদিন আগে নাদিরাকে নিয়ে নিউ ইয়র্ক পৌঁছেছে মাসুদ রানা। আসার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে, পথে বসাবে ও গার্সিয়াকে। চোরের ওপর বাটপারি করবে, স্রেফ ডাকাতি করবে ওর দোকানে। ঢিলের বদলে পাটকেল খেতে হবে মাফিয়া বাবাজীকে। সম্পদ হারানোর ব্যথা হাড়ে হাড়ে তাকে টের পাওয়াবে মাসুদ রানা। কিন্তু কাজটা ছেলেখেলা নয়, তাই খুব সাবধানে এগোচ্ছে ও।

পৌঁছেই এখানকার এক ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক বন্ধুর সাহায্যে গত কয়েক বছরে আমেরিকায় যত বড় ধরনের জুয়েল রবারির ঘটনা ঘটেছে, তার প্রায় সবগুলোর বিস্তারিত বিবরণ জোগাড় করেছে মাসুদ রানা। এক কুড়ি বিস্তারিত রিপোর্ট। সব মিলিয়ে ফাইলটা হয়েছে দশাসই। একবার করে পড়েছে ও সবগুলো। একটা ব্যাপার কেমন সন্দেহজনক মনে হয়েছে রানার ওগুলো পড়ে। প্রায় সব ক'টা ডাকাতিই একই কায়দায় সংঘটিত হয়েছে, প্রায় একই টেকনিক ব্যবহার করেছে ডাকাতরা।

এখানকার রানা এজেন্সির চীফ শওকত জানে কেন নিউ ইয়র্ক এসেছে মাসুদ রানা। আর জানে শেখ জাবের আল উবায়েদের নাতনী নাদিরা। অন্যরা জানে না। প্রাথমিক প্রস্তুতির কাজ শেষ, এবার সবাইকে জানাবে মাসুদ রানা। এবং আগামীকাল গার্সিয়ার দোকানটা দেখতে যাবে নাদিরাকে সঙ্গে নিয়ে। তারপর হাত দেবে মূল কাজে। কফি শেষ করে উঠল মাসুদ রানা। মাফিয়াকে আণ্ডার এস্টিমেট করে না ও, তাই রানা এজেন্সিতে থাকার ঝুঁকি এড়াবার জন্যে হোটেলে এসে উঠেছে। গত তিনদিন ছিল

হিলটনে। আজ চেহারা পাল্টে এসে উঠেছে হার্ড-অনে। অপারেশন শেষ না করা পর্যন্ত এখানেই থাকবে ও।

লবিতে আরও তিন বোর্ডারের সঙ্গে এলিভেটরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা, এমন সময় বিশ-বাইশ বছরের একটি মেয়ে এসে দলে যোগ দিল। লালচে সোনালী রঙের চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা তার। পরনে খাটো স্কার্ট। টাইট ব্লাউজ। পায়ে তিন ইঞ্চি উঁচু হিল। মুখে কড়া মেকআপ। তাকে অহেতুক এর-ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে দেখে সবাই বুঝল, মেয়েটি বারবণিতা। দেহের তুলনায় তার বুক আর নিতম্ব বেশ ভারি।

মুখ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিল মাসুদ রানা, ফিক্ করে হেসে উঠল মেয়েটি ওর চোখে চোখ রেখে। 'জাস্ট মুভ ইন?'

মাথা দোলাল ও।

'ওয়েল কাম টু হার্ডিং,' আবারও অহেতুক গা দুলিয়ে হাসল সে। সম্ভবত ওর চেহারা, পোশাক আকর্ষণ করেছে তাকে। 'কোন ফ্লোর?'

'সেভেনথ।'

'সত্যি? আমিও। সাতশো পাঁচ নম্বর রূম। কোন প্রয়োজন পড়লে দ্বিধা করবেন না, সরাসরি চলে আসবেন।'

'নিশ্চই!' সৌজন্যের হাসি ফুটল মাসুদ রানার মুখে। 'ধন্যবাদ।'

পাশ থেকে কে যেন কনুই চালাল ওর পাঁজরে। ঘুরে তাকাল রানা। এক নিগ্রো যুবক। চোখাচোখি হতে একটা চোখ টিপল যুবক। 'আমাকে আমন্ত্রণ করলে প্রয়োজন পড়ার অপেক্ষায় থাকতাম না, একটা বানিয়ে হাজির হয়ে যেতাম ওর ঘরে,' নিচু কণ্ঠে বলল সে। এতই নিচু কণ্ঠে যে অন্যরাও পরিষ্কার শুনতে পেল।

মেজাজ খিঁচড়ে গেল মাসুদ রানার। কিন্তু সামলে নিল। মুখ ঘুরিয়েই খাঁচাটাকে হাঁ করে থাকতে দেখে ঢুকে পড়ল ভেতরে। অন্যদের সঙ্গে মেয়েটিও উঠল। থেকে থেকেই রানাকে দেখছে সে, হাসছে মুখ টিপে। সাত তলায় নামল ওরা, নিগ্রো যুবকটিও নামল। হাত নেড়ে মাসুদ রানাকে টা-টা জানাল মেয়েটি, নিতম্বে ঢেউ তুলে চলে গেল নিজের রূমের দিকে।

সেদিকে খেয়াল নেই মাসুদ রানার। করিডরে পা রেখেই থেমে পড়েছে। বাঁয়ে করিডরের প্রান্তে ওর রূমের দরজা হাঁ করে খোলা। আশ্চর্য! পরিষ্কার মনে আছে বেরোবার সময় দরজায় তালা মেরে গিয়েছিল রানা। তাড়াতাড়ি এগোল ও। মোটা, বয়স্ক এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে রূমের মাঝে। চোখে হতভম্ব দৃষ্টি, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। 'হ্যালো!'

চমকে ঘুরে তাকাল মহিলা। 'ওহ্! মিস্টার কার্নি, স্যার?'

'হ্যাঁ!'

'আমি ক্লারা, হাউসকীপার। এসেছিলাম রূম গোছাব বলে, কিন্তু... ।'

পাঁচ ডলারের একটা নোট মহিলার হাতে গুঁজে দিল মাসুদ রানা। 'অনেক ধন্যবাদ, ক্লারা। ও কাজ আমি নিজেই সেরে ফেলেছি।'

নোটটা দেখে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্লারার। 'থ্যাঙ্কস, সানি। গড ব্লেস। যখন যা লাগবে আমাকে বলবে, কেমন?'

'বলব।'

আরেক পশলা চওড়া হাসি দিয়ে বেরিয়ে গেল মহিলা। দরজা বন্ধ করে দিল রানা। ছিটকিনি লাগিয়ে সিকিউরিটি চেইনের দিকে হাত বাড়াল। আবিষ্কার করল, চেইন আছে ঠিকই, কিন্তু যার ভেতর ঢোকানো হয় তার প্রান্ত, সেই পট নেই। কি আর করা!

হার্ড-অন যখন। কাপড় পাল্টাল মাসুদ রানা, তারপর পেপার কাটিঙের ফাইলটা ব্যাগ থেকে বের করে উঠে পড়ল বিছানায়।

চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল কাহিনীগুলোর ওপর। প্রথমবার শুধুই চোখ বোলাল মাসুদ রানা, তারপর ছেড়ে ছেড়ে পড়ে গেল সবগুলো। এরপর আরও আধ ঘণ্টা ব্যয় করল কোনটা কোনটা ওর বিশেষ কাজে আসবে, তা বাছাইয়ের পিছনে। সবশেষে পাঁচ-ছয়টা ঘটনার পেপার কাটিং বাতিল করে দিল রানা। বাকি রইল চোদ্দটা।

চোদ্দটা জুয়েলারি স্টোর ডাকাতির রোমহর্ষক কাহিনী। গত তিন বছরের মধ্যে ঘটেছে ডাকাতিগুলো, এর মধ্যে দুটো ঘটেছে নিউ ইয়র্কের ডায়মণ্ড ডিস্ট্রিক্ট, ওয়েস্ট ফর্টি সেভেনথ স্ট্রীটে। এ দুটোই সবচেয়ে বড় ঘটনা, কয়েক কোটি ডলারের জুয়েলারি লুটে নিয়ে গেছে ডাকাতরা। অন্যগুলো ঘটেছে শিকাগো, বিভারলি হিলস্, ডালাস, আটলান্টা, মায়ামি, ডেনভার প্রভৃতি জায়গায়।

এগুলোর মধ্যে মাত্র একটার মোকাবেলা করতে পেরেছে পুলিস। পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে অপরাধীদের। অন্যগুলোর সত্যিই কি কোন সুরাহা করতে পারেনি? আনমনে ভাবল মাসুদ রানা। একটা সিগারেট ধরাল। হয়তো পেরেছে, অনেক দেরিতে। যখন ঘটনাটার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে পত্রিকাওয়ালারা, কেউ ধরা পড়ে থাকলে আগের মত গুরুত্ব দিয়ে প্রথম পাতায় ছাপেনি। ছেপেছে হয়তো চল্লিশ কি পঞ্চাশ পাতায়, ছোট্ট করে। যে কারণে সেগুলো সংগ্রহ করতে পারেনি মাসুদ রানা। পারার কথাও নয়।

আবার ফাইলে মন দিল ও। আবিষ্কার করল, চোদ্দটা ডাকাতির এগারোটাই সংঘটিত হয়েছে প্রকাশ্য দিনের আলোয়, বাকি তিনটে রাতে। রাতে কম হওয়ার কারণও অবশ্য আছে।

রাতে এসব প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্বভাবতই খুব কঠোর। নিকটস্থ পুলিস স্টেশন বা কোন প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সির সঙ্গে ইলেক্ট্রনিক অ্যালার্মিং ব্যবস্থা থাকে এদের। দরজা ভেঙে বা আর কোন উপায়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করা হলে মুহূর্তে খবর পৌঁছে যায় জায়গামত। যে কারণে দিনেই সুবিধে।

যে একটা ঘটনার কিনারা করতে পেরেছে পুলিস, সেটি ছিল রাতের, দিনের নয়। দিনে সংঘঠিত সবগুলোতেই শতকরা একশো ভাগ সফল হয়েছে অপরাধীরা। স্কি মাস্ক অথবা মোজা মাথায় পরে নানান রকম ছদ্মবেশ নিয়ে কাজে নামে ওরা। মাথায় পরচুলা, মুখে দাড়ি-গোঁফ থাকে। আরও অনেক সতর্কতা অবলম্বন করে ওরা যাতে কেউ চিনে ফেলতে না পারে।

আবার পড়তে শুরু করল রানা বিবরণগুলো। এবার ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দরজায় নকের শব্দে মুখ তুলল ও, 'কে?'

'আমি। আপনার প্রতিবেশী,' বলল একটা মেয়ে কণ্ঠ।

মুচকে হেসে বিছানা থেকে নেমে পড়ল রানা। তাড়াতাড়ি খুলে দিল দরজা।

ভেতরে ঢুকল সেই মেয়েটি। হাসছে, তবে আগের মত গা দুলিয়ে নয়।

হাসল রানাও। দেখল তাকে আপাদমস্তক। 'একদম নিখুঁত হয়েছে। প্রথমে চিনতেই পারিনি।'

'যাক,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল নাদিরা। 'পাস করেছি তাহলে!'

'বোসো।'

আর্ম চেয়ারটা খাটের কাছে টেনে নিয়ে এসে বসল মেয়েটি। মাসুদ রানা বসল খাটে। 'কি করছিলেন?'

'পেপার কাটিংগুলোয় চোখ বোলাচ্ছি।'

'জুয়েল রবারি?'

'হ্যাঁ।'

আনমনা হয়ে পড়ল নাদিরা। 'আপনাকে বোধহয় বড় রকম ঝামেলায় ফেলে দিলাম।'

'মোটেই না। তোমার নানা আমার বসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, কাজেই তাঁর নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং জিনিসগুলোর একটা বিহিত করা আমি কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছি।'

'কিন্তু গার্সিয়ার যে পরিচয় আপনার মুখে শুনেছি, তাতে ভয় ধরে গেছে। যদি কোন ঝামেলা হয়ে যায়?'

'হবে না। মনে জোর রাখো।'

'কবে কাজ সারবেন ঠিক করেছেন?'

'এখনই নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছি না। অনেক কিছু জানতে বাকি এখনও, অনেক কিছু বোঝা বাকি রয়ে গেছে।'

চার

ইস্ট ফিফটি ফিফথ স্ট্রীট। জুয়েলারি বিক্রেতা অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্স। সামনের পুরোটা আর্মার্ড কাঁচ ঘেরা। আমেরিকার প্রথম সারির টিফানি বা কার্টারের পর্যায়ে পড়ে না দোকানটা, তবে ডায়মণ্ডসহ অন্যান্য মূল্যবান রত্নের মজুত ও চাকচিক্যের দিক থেকে একেবারে কমও যায় না।

ভেতরের সাজ-সজ্জা ও অভিজাত আড়ম্বর চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। ভেতরে গ্রাহকদের বসার জন্যে রয়েছে পঞ্চদশ লুই আমলের ডিজাইনের পুরু গদি মোড়া চেয়ার। মেঝেতে তুলোর মত নরম কার্পেট, পা রাখলে গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যায়।

এল-প্যাটার্নের পুরু কাঁচের তৈরি শো কেসটাও চেয়ে দেখার মত। ভেতরে সাজিয়ে রাখা আছে অজস্র চোখ ঝলসানো অলঙ্কার। বেশিরভাগই ডায়মণ্ডের। ওদিকে সামনের আর্মার্ড গ্লাসের ভেতর দিকে রয়েছে উইণ্ডো ডিসপ্লে কেস। সব মিলিয়ে চমৎকার সাজানো-গোছানো ছিমছাম একটা দোকান।

'এল'-এর খাটো মাথার অর্ধেকটা জুড়ে আছে আলাদা একটা কাউন্টার। পুরানো আমলের হাত ঘড়ি ও অ্যান্টিক জুয়েলারি কেনাবেচা হয় ওখানে। ব্যাপারটা পুরোপুরি বেমানান লাগল মাসুদ রানার। এই কাউন্টারের পিছনের দেয়াল জুড়ে প্রকাণ্ড এক আয়না ঝুলছে। চারদিকে যথাসম্ভব দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল ও ভেতরে পা দিয়েই। গাঢ় বাদামী রঙের দামী কাপড়ের কমপ্লিট সুট পরেছে রানা। সাদা শার্ট, সাদা বুটিওয়ালা টকটকে লাল টাই। পায়ে চেহারা দেখা যায় এমন চকচকে কালো জুতো।

নাদিরা পরেছে নীল জিনস্, কেডস এবং ডিমের কুসুম রঙের মোটা পুলওভার। এ মুহূর্তে স্বরূপে আছে নাদিরা। উচ্চতা পাঁচ ফুট ছয়। সাদা জমিনে গাঢ় নীল বড় বড় চোখ। নাকটা খাড়া। থুত্‌নিতে গভীর খাঁজ। হাসলে টোল পড়ে গালে। দুধে আলতা মেশানো গায়ের রং নাদিরার। ঘাড়ের কাছে ইউ-র মত করে কাটা একরাশ ঘন কালো চুল। সব মিলিয়ে অপূর্ব লাগছে দেখতে।

ছয়জন সেলসম্যান, গুণে দেখল মাসুদ রানা। এল-এর দীর্ঘ বাহুর পিছনদিকে সেলসম্যানদের অবস্থান। এদের পিছনের দেয়ালে কোমর সমান উঁচুতে আছে লম্বা একটা স্টীলের রেইল, এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত। সেলসম্যান প্রত্যেকেই অল্পবয়সী, দীর্ঘদেহী, স্মার্ট এবং পেটা স্বাস্থ্যের অধিকারী। চলনে চিতার ক্ষিপ্রতা, বলনে কেতাদুরস্ত। চেহারা বলে, এদের একজনও এদেশী নয়। ইউরোপীয়ান। এবং অবশ্যই ইটালিয়ান। গেটের

গার্ডটিও তাই। লোকটাকে দেখে নিরস্ত্র মনে হলেও মাসুদ রানার অভিজ্ঞ চোখ তার বাঁ বগলের নিচে শোল্ডার হোলস্টারের উপস্থিতি টের পেয়েছে পয়লা দর্শনেই। দোকানটা আয়তাকার। পিছন দিকে, কাউন্টারের ওপাশে, প্রকাণ্ড আয়নাটার পাশে পুরু আর্মার্ড স্টীলের ছয় বাই চার একটা দরজা। খোলা আছে ওটা এ মুহূর্তে। ভেতরে বড়সড় একটা রূম, সম্ভবত স্টোর রূম। প্রকাণ্ড একটা সেফ দাঁড়িয়ে রয়েছে ওখানে এদিকে মুখ করে।

বড় শক্ত চীজ ওটা, ভাবল মাসুদ রানা। প্রয়োজন দেখা দিলে দাঁত ফোটানো খুব কঠিন হবে। ভেতরে কোন টিভি ক্যামেরা নেই, নিশ্চিত হলো রানা, তবে অ্যালার্ম বাটন আছে নিঃসন্দেহে। যদিও তেমন কিছু নজরে পড়ল না। লুকোনো আছে। সামনের কাঁচের দেয়ালের ওপাশে আছে স্টীলের শাটার। নিরাপত্তার আয়োজনে কোথাও কোন কমতি রাখেনি গার্সিয়া।

ভেতরে কয়েকজন খদ্দের আছে। সেলসম্যানরা তাদের সামাল দিতে ব্যস্ত। এতে সুবিধেই হলো মাসুদ রানার, কয়েক মুহূর্ত বাড়তি সময় পেয়েছে ও চারদিকে নজর বোলাবার। বেঁটে, গাট্টাগোট্টা স্বাস্থ্যের এক লোক নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে। দেখেই বুঝল রানা এ-ই সেই। রবার্টো গার্সিয়া। দোকানের ভেতরটা এয়ারকণ্ডিশণ্ড, তাই কোট খুলে রেখেছে লোকটা। শার্টের নিচে কিলবিল করছে তার থোক্ থোক্ পেশী।

ভাল করে দেখল রানা গার্সিয়াকে। পাঁচ ফুট সাড়ে ছয়ের বেশি হবে না লোকটা। বুকের ছাতি ব্যারেলের মত। ট্রাউজারের নিচে ব্যাটার ঊরু কলা গাছের মত মোটা। স্রেফ ষাঁড় একটা। চেহারা অবশ্য ভাল মানুষের মত। রীতিমত ভদ্র, গোবেচারা চাউনি। দেহের তুলনায় মাথা কিছুটা বড়, চৌকো চোয়াল। নাক খাড়া। আটাশ থেকে তিরিশের মধ্যে হবে বয়স। সব মিলিয়ে

মানুষটিকে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হলো মাসুদ রানার। ওদের সামনে এসে দাঁড়াল গার্সিয়া হাসি মুখে।

'গুড্ আফটারনুন,' ইটালিয়ান অ্যাকসেন্টে অভিবাদন জানাল সে। বো করল মাথা ঝুঁকিয়ে, মুখে মধুর হাসি। 'আপনাদের কোন সাহায্যে লাগতে পারি?' নজর সেঁটে আছে তার নাদিরার ওপর।

'একটা এনগেজমেন্ট রিং খুঁজছি,' বলল মাসুদ রানা। হাসি মুখে নাদিরাকে দেখল এক পলক। 'ডায়মণ্ড রিং অবশ্যই।'

'হোয়াই, ইয়েস!' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। এনগেজমেন্ট রিং কিনতে আসা দুই যুবক-যুবতীর সম্পর্কের ব্যাপারে চট্ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল গার্সিয়া। 'আসুন, আসুন! প্রচুর ডায়মণ্ড রিং আছে আমাদের। গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, আমাদের মত এত চমৎকার আংটি নিউ ইয়র্কে আর কেউ দিতে পারবে না। কাম, দিস ওয়ে, প্লীজ!'

গোটা চারেক ডায়মণ্ড আংটি বের করে ওদের দেখতে দিল গার্সিয়া। পরক্ষণে তার এক মন্তব্যে ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল নাদিরা। 'আপনাকে খুব চেনা চেনা লাগছে, ম্যাডাম। আগে কোথাও দেখেছি নিশ্চই?'

'আমাকে?' শক্ত হয়ে গেল মেয়েটি। মাসুদ রানারও একই অবস্থা। 'কি জানি! হতে পারে।'

'আগে সম্ভবত বান্ধবীর জন্যে নেকলেস কিনতে এসেছিলেন আপনি একবার।' হাসি আরও চওড়া হলো গার্সিয়ার। 'হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে, সত্যিই এসেছিলেন। ভুলে গেলেন?'

হারামজাদার স্মরণশক্তি তো সাংঘাতিক, ভাবল মাসুদ রানা। মনে মনে প্রার্থনা করল সব গুবলেট করে না ফেলে মেয়েটা। কিন্তু না, চমৎকার ম্যানেজ করে নিল সে। 'ও-ও, আচ্ছা! এটাই সেই দোকান? কি আশ্চর্য, খেয়ালই করিনি আমি।' ভেতরে যা-ই

চলুক, মুখে খানিকটা হাসিও ফোটাতে পারল নাদিরা শেষ পর্যন্ত।

'দেখলেন?' বিজয়ীর হাসি দিল গার্সিয়া। 'ঠি-ক মনে রেখেছি! কোন চেহারা একবার দেখলে জীবনেও ভুলি না আমি।'

সেরেছে! মনে মনে বলল মাসুদ রানা, শ্বশুরের ছেলে দেখছি ফটোগ্রাফিক মেমোরির অধিকারী। এরপরও কিছু মন্তব্য না করলে খারাপ দেখায়, তাই নাদিরার দিকে তাকাল রানা কৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে। 'বলো কি! এখনই এত ভুলোমন? বিয়ের পর আমাকে চিনতে ভুল করে বসবে না তো?'

'যাহ্!' কনুই চালাল নাদিরা। হা হা করে হেসে উঠল গার্সিয়া, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল অন্য খদ্দের, সেলসম্যানদের অবাক চোখে ঘুরে তাকাতে দেখে। ব্যস্ততার ভান করে ঝুঁকে পড়ল শো কেসের ওপর।

সাড়ে চার হাজার ডলারের একটা আংটি পছন্দ করল মাসুদ রানা। কিনে নিল ওটা। সুন্দর মোড়কে পেঁচিয়ে বাক্সসহ আংটিটা প্যাক করে দিল গার্সিয়া। 'আবার আসবেন, ম্যাডাম।'

'আসব। ও হ্যাঁ, আপনি দেখছি পুরনো হাতঘড়িও কেনা-বেচা করেন।'

'করি। কেন? আছে নাকি আপনার? বিক্রি করবেন?'

'আছে একটা।'

'কত পুরনো?'

'তা আশি-নব্বই বছর তো হবেই।'

'নিয়ে আসুন একদিন। ভাল দাম পাবেন।'

'আচ্ছা, নিয়ে আসব। ধন্যবাদ।'

মাসুদ রানার উদ্দেশে লম্বা বো করল এবার গার্সিয়া। বিদায় জানাচ্ছে। কিন্তু দেখেও না দেখার ভান করল ও। 'ভেতরটা ঘুরে দেখতে পারি আমরা?'

‘বাট অফকোর্স, একশোবার! দেখুন না। আমি আছি এখানেই। আর কোন আইটেম দেখতে চাইলে বলবেন।’

শো-কেস দেখায় মন দিল ওরা। গার্সিয়ার কাছ থেকে কয়েক পা সরে এসে প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল নাদিরা, ‘কী সাংঘাতিক মানুষ। সেই কবে দেখেছে সামান্য কয়েক মিনিটের জন্যে। এখনও ভোলেনি!’

‘হুম্‌ম্!’ মাসুদ রানা গম্ভীর। চিন্তায় ডুবে আছে।

মিনিট পাঁচেক ঘুরল ওরা। ডায়মণ্ড, রুবি, স্যাফায়ার, এমারেল্ড, ক্রিস্টাল, টোপাজ, গার্নেট ইত্যাদি পাথরের তৈরি হাজারো নকশার অলঙ্কার সেট দেখল। হাঁটতে হাঁটতে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল নাদিরা এক জায়গায়। ডায়মণ্ড বসানো নেকলেস, ব্রেসলেট ও ইয়ার রিঙের একটা সেটের দিকে তাকিয়ে আছে অপলক।

চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করল মাসুদ রানা। ‘কি হলো?’

‘এই আরেকটা! সাতাশি সালে ডুসেলডফের এক নীলাম থেকে কিনেছিলেন নানা।’

‘কিছু বললেন, ম্যাডাম?’ আচমকা ওদের মাঝখানে ঢুকে পড়ল গার্সিয়া।

‘এই সেটটা দেখতে পারি?’ আঙুল তুলে দেখাল মাসুদ রানা।

‘নিশ্চই!’ নিজেই শো কেস থেকে ওগুলো বের করল লোকটা।

যেন মুগ্ধ হয়েছে খুব, এমন দৃষ্টিতে উল্টেপাল্টে দেখল রানা সেটটা। নাদিরা স্পর্শ করল না। মুখে বহু কষ্টে জোগাড় করা এক টুকরো হাসি ফুটিয়ে তাকিয়ে থাকল শুধু। ‘চমৎকার সেট!’ বলল রানা। ‘আপনাদের তৈরি?’ যা দেখার দেখে নিয়েছে।

‘না, স্যার। বাইরে থেকে কেনা।’

‘কত দাম?’

‘দুইশো আশি হাজার ডলার।’

‘আই সী! সত্যি চমৎকার।’

‘ধন্যবাদ, স্যার।’

যেটা যেমন ছিল, বাক্সে ভরে এগিয়ে দিল ও গার্সিয়ার দিকে। ‘অনেক ধন্যবাদ।’

‘ঘড়িটা আনতে ভুলবেন না, ম্যাডাম।’

‘না, ভুলব না।’

বেরিয়ে এল ওরা রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্স থেকে। ‘তিনটেরই পিছনে ঘষার দাগ ছিল,’ অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল নাদিরা।

‘দেখেছি। দাগগুলো প্রায় বোঝাই যায় না।’ সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

‘এটা নিয়ে দুই দফায় গোটা দশেক দেখলাম, রানা। দেখলেই বলে দিতে পারি আমি কোনটা আমাদের।’ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল মেয়েটি। ‘এতদিনে নিশ্চই অনেকগুলো বিক্রি করে ফেলেছে লোকটা।’

‘আজ ওই একটা সেটই দেখেছ?’

‘হ্যাঁ। আর কিছুক্ষণ থাকলে হয়তো আরও দু’চারটে আইডেন্টিফাই করতে পারতাম।’

চিন্তায় ডুবে গেল মাসুদ রানা। ও জানে, এখানকার মাফিয়া পরিবারগুলোর মধ্যে রবার্টো গার্সিয়ার বাবা ডন পাওলো গার্সিয়া যথেষ্ট প্রভাবশালী। তার ছেলের বিরুদ্ধে বলতে গেলে একাই লাগতে হবে রানাকে, কারও কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। কাজেই যা করার খুব সুচারুভাবে করতে হবে, যাতে রবার্টো ধাওয়া করার মত কোন সূত্র না পায়।

ভেতরে রবার্টো আর সেলসম্যানসহ সাতজন, আর গেটের গার্ড, মোট আট জনকে দেখেছে মাসুদ রানা। ভেতরের রূমে আরও কেউ আছে হয়তো। থাক না থাক, আছে ধরে হিসেব করা ভাল, কমপক্ষে দু'জন। মোট দশজন। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে মাসুদ রানা, ঘটনাটা দিনের বেলাতেই ঘটাতে হবে। রাতের চেয়ে দিনেই সুবিধে, অতীতের ডাকাতির রিপোর্টগুলোও তাই বলে। অর্থাৎ চার-পাঁচ জন খদ্দেরের কথাও মাথায় রাখতে হবে।

কিন্তু দিনে কখন? সকালেই, লাঞ্চ আওয়ারে, না বিকেলের দিকে? উত্তরটা পেতে হলে কয়েক দিন রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। অন্তত এক সপ্তাহ। ভাবতে ভাবতেই এ কাজের উপযুক্ত, পছন্দসই একটা জায়গা পেয়ে গেল মাসুদ রানা। দোকানটার উল্টোদিকে একটা বড় রেস্তোরাঁ আছে, ওখানে বসেই কাজটা সারা যাবে।

লক্ষ রাখতে হবে, কখন খোলে দোকানটা, কখন বন্ধ হয়। কয়জন কর্মচারী রিপোর্ট করে সকালে, কোন সময় খদ্দেরের উপস্থিতি কি রকম থাকে ইত্যাদি। হঠাৎ কি খেয়াল হতে নাদিরার দিকে তাকাল মাসুদ রানা। 'পুরনো কোন ঘড়ি সত্যিই আছে নাকি তোমার কাছে?'

'আছে।'

'গুড আইডিয়া।'

'মানে?'

'পরে বলব।'

পরদিন থেকে সকালের নাশতা এবং দুপুর ও রাতের খাওয়ার জন্যে নিয়মিত ওই রেস্টুরেন্টে আসা-যাওয়া শুরু করল মাসুদ

রানা। এক টেবিলে বসে না ও ইচ্ছে করেই, খালি থাকলেও না।

সকালে একটায় বসে তো দুপুরে আরেকটায়। রাতে অন্যটায়। তবে সবগুলোই জানালা ঘেঁষা। পরিষ্কার দেখা যায় রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সের প্রবেশ পথ। আরও সুবিধে যে রেস্টুরেন্টটা প্রায় সব সময়ই খদ্দেরে পূর্ণ থাকে। কাজেই একজনকে রোজ তিনবেলা হাজিরা দিতে দেখলেও খুব একটা লক্ষ করে না কেউ। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে সে কি করছে, সেদিকে তাকানোর তো প্রশ্নই আসে না।

তবু মাসুদ রানা কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। তাই তিন দিন পর রুটিন পরিবর্তন করল। সকালে কোন কার রেন্টাল সার্ভিস থেকে সারাদিনের জন্যে গাড়ি ভাড়া করে। দূর থেকে রবার্টো গার্সিয়ার প্রবেশপথ মোটামুটি দেখা যায়, এমন জায়গা বেছে নিয়ে গাড়ি ডবল পার্ক করে বসে থাকে। এভাবে পাঁচদিনেই যা জানার ছিল জেনে নিল ও।

দোকান খোলে ঠিক দশটায়। তবে কর্মচারীরা ভেতরে ঢোকে আটটা পঁয়তাল্লিশ থেকে নয়টার মধ্যে। নয়টায় আসে কমার্শিয়াল ক্লিনারের গাড়ি। ভেতরটা ঝাড়-মোছ ইত্যাদি করে ইউনিফর্ম পরা দুই ক্লিনার। তারা পৌঁছুলে স্বয়ং মালিক-কাম-ম্যানেজার খুলে দেয় আর্মার্ড গ্লাস ডোর। এবং লোক দুটো ঢোকামাত্র ফের বন্ধ করে দেয়। বাইরের স্টীল শাটার নামানো থাকে তখন, কাজেই ভেতরে কি হয় বোঝার উপায় থাকে না।

চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ভেতরে থাকে ক্লিনাররা, তারপর ভ্যাকিউম ক্লিনার, ঝাড়ন ইত্যাদিসহ বেরিয়ে আসে। তাদের বের করে দিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দেয় গার্সিয়া। রানার অনুমান, পরের পনেরো মিনিট উইণ্ডো কেসগুলো সাজাতে ব্যস্ত থাকে কর্মচারীরা।

অবশেষে ঠিক দশটায় খুলে যায় ওটার প্রবেশ পথ, সিকিউরিটি গার্ড অবস্থান নেয় দরজার সামনে, ঘড় ঘড় শব্দে উঠে যায় শাটার। শুরু হয় দিনের কাজ। একদিনও এই নিয়মের সামান্যতম ব্যতিক্রমও চোখে পড়েনি মাসুদ রানার। ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সের কার্যক্রম।

ওদিকে, কর্মচারীর সংখ্যা হিসেব করার সময় রানা যে দু'জনকে বাড়তি ধরেছিল, দেখা গেল হিসেবটা একদম সঠিক ছিল। পরের দু'জন সম্ভবত কারিগর হবে। পিছনের রুমে বসে কাজ করে বলে দেখতে পায়নি সেদিন ওরা। লাঞ্চ ব্রেকে এক সঙ্গে দু'জনের বেশি কর্মচারী বের হতে দেখেনি রানা কখনও। প্রথম জোড়া ফিরলে আরেক জোড়া বের হয়। সবার শেষে বের হয় গার্সিয়া। মাত্র পনেরো মিনিট। তারপরই ফিরে আসে।

সন্ধে পাঁচটায় বন্ধ হয়ে যায় দোকান। শাটার নেমে যায়, ফলে ভেতরে কি ভাবে কি করা হয় দেখার উপায় থাকে না। রানার অনুমান, দামী দামী সব অলঙ্কার ইত্যাদি পিছনের সেফে ঢোকানো হয় ওই সময়। এবং ভেতরের বার্গলার অ্যালার্ম সিস্টেম অ্যাকটিভেট করা হয়।

সাড়ে পাঁচটায় বেরিয়ে আসে সবাই। সবার শেষে থাকে গার্সিয়া। বেরোবার আগে ডান হাত উঁচু করে দরজার প্যানেলে কিছু একটা করে সে। সম্ভবত দ্বিতীয় অ্যালার্ম সিস্টেম অ্যাকটিভেট করে। যখন বেরোয়, গেটের গার্ড এবং আরও দুই সেলসম্যান থাকে তার সঙ্গে। অন্যদের এক হাত থাকে পকেটে, গার্সিয়ার দুই হাতই।

গাড়ি নিয়ে দ্রুত পার্ক অ্যাভিনিউ যায় দলটা প্রথমে, ওখান থেকে এক ব্লক দক্ষিণে। ওখানে পকেট থেকে ডিকশনারি সাইজের একটা প্যাকেট বের করে গার্সিয়া, একটা ব্যাঙ্কের নাইট

ডিপোজিট বক্সের পট দিয়ে গলিয়ে দেয় ওটা। তারপর গার্ড ছাড়া অন্য দু'জনকে বিদেয় করে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে যায়। গাড়ি চালায় গার্ড। অর্থাৎ লোকটা তার বডিগার্ড।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে রানা এই ক'দিনে। গার্সিয়ার যারা খদ্দের, তারা প্রায় প্রত্যেকেই শোফার চালিত লিমুজিনে আসে। ছোট-মোট গাড়ি তেমন একটা আসে না। অর্থাৎ তার কারবার সব পয়সাওয়ালাদের সঙ্গে। আরেক ধরনের লোকও আসা যাওয়া করে ওর দোকানে। প্রত্যেকে তারা তরুণ, বডি বিল্ডার। পরনে থাকে দামী কাপড়ের কনজারভেটিভ সুট, হাতে কালো ব্রিফকেস।

বাঁ হাতের কব্জির সঙ্গে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে আটকে রাখা থাকে ব্রিফকেস। একেকদিন একেক জন আসে তারা। কোন সঠিক সময় নেই, সকালে দুপুরে বিকেলে যে কোন সময় এসে হাজির হয়। তবে রোজ একজনের বেশি আসে না। রানা ধরে নিয়েছে ওরা রবার্টো গার্সিয়ার সেলসম্যান, অথবা হোলসেল জুয়েলারি মার্চেন্টের কুরিয়ার। অর্ডার মাফিক তৈরি মাল ক্রেতার বাসায় পৌঁছে দিতে যায়, নয়তো আর কিছু।

তবে লোকগুলো যা-ই হোক, এক-দেড় ঘণ্টার বেশি ভেতরে থাকে না। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে আরও দু'দিন দোকানটার ওপর নজর রাখল রানা। আট দিনের দিন সকাল এগারোটার দিকে হাজির হলো নাদিরা রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সে।

'সেনিয়র গার্সিয়া?' ওর প্রশ্নের উত্তরে বলল এক সেলসম্যান। 'উনি এ মুহূর্তে ব্যস্ত আছেন।'

'আমি ওঁর জন্যে অপেক্ষা করতে চাই।'

'নিশ্চই, বসুন,' একটা চেয়ার ইঙ্গিত করল সে।

বসে পড়ল নাদিরা। এই সময় আরেক মহিলা খদ্দের ঢুকল

ভেতরে। ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে সেদিকে এগোল যুবক। চারদিকে ভাল করে নজর বোলাবার চমৎকার একটা সুযোগ জুটে গেল নাদিরার।

পিছনদিকের ভল্ট রূমের মুখোমুখি বসেছে ও। দরজাটা বন্ধ এ মুহূর্তে। গার্সিয়া লোকটা হয়তো ভেতরে আছে। নিজের চারদিকে নজর দিল নাদিরা। দোকানটা লম্বায় ষাট ফুট, পাশে ত্রিশ ফুট মত হবে, অনুমান করল ও। গেটের গার্ড এদিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, চোখ রাস্তায়। ছয়জন সেলসম্যানের সবাই ব্যস্ত খদ্দের সামলাতে।

বেশ নিচু গলায় কথা বলছে খদ্দের-কর্মচারী। শো-কেসের পাইডিং ডোর খুলে এটা-ওটা বের করছে সেলসম্যানরা, বিন্দুমাত্র শব্দ হচ্ছে না। ফ্লোরে জুতোর ঠুক্ ঠাক্ নেই, পুরু কার্পেট শুষে নিচ্ছে সব আওয়াজ। বাইরের কোন আওয়াজও আসছে না। সুনসান পরিবেশ।

সেলসম্যানদের দিকে নজর দিল এবার নাদিরা। লোকগুলো সবাই সমান দীর্ঘ। স্বাস্থ্যও একইরকম। নেভি ব্লু ব্লেজার আর গ্রে ফ্লানেল প্যাকসে একইরকম লাগছে ওদের দেখতে। নাদিরার মনে হলো, ওদের চেহারায় অশুভ কি যেন একটা আছে। অভিব্যক্তিহীন, কঠোর। দৃষ্টি সতর্ক। দম দেয়া পুতুলের মত কাজ করে চলেছে। হাঁটা চলায় চটপটে।

পিছনের দরজা খুলে যেতে মনোযোগ হারিয়ে ফেলল নাদিরা। ঘুরে তাকাল। ভল্ট রূম থেকে বেরিয়ে এল গার্সিয়া ও আরেক যুবক, তার বাঁ হাতে হ্যাণ্ডকাফ পরানো একটা ব্রিফকেস। এদিকে তাকাল না গার্সিয়া, যুবককে নিয়ে সরাসরি প্রবেশ পথের দিকে এগোল। নিচু গলায় কথা বলছে।

যুবক বেরিয়ে যেতে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। এদিক ওদিক

একবারও না তাকিয়ে সরাসরি এসে দাঁড়াল ওর সামনে। তাজ্জব হয়ে গেল নাদিরা লোকটা ওর আসার খবর কি করে পেল ভেবে। যে সেলসম্যান ওকে বসিয়েছে এখানে, সে এখনও খদ্দের সামলাতে ব্যস্ত। তাহলে? ব্যাপারটা ভাবনায় ফেলে দিল।

'আপনাকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখতে হলো বলে খুব দুঃখিত আমি, ম্যাম,' অমায়িক হেসে বলল গার্সিয়া। 'ঘড়িটা নিয়ে এসেছেন নিশ্চই?'

চেষ্টা করেও চেহারায় ফুটে ওঠা বিস্ময় গোপন করতে পারল না নাদিরা। দ্বিতীয় দফা লোকটা ওকে দেখেছে সাত আটদিন আগে। ও কেন এসেছে, মনে করতে এক সেকেণ্ড সময়ও লাগল না তার!

ব্যাপার টের পেয়ে হাসিটা আরও প্রশস্ত হলো গার্সিয়ার। 'বলেছি না, কোন মুখ একবার দেখলে জীবনেও ভুলি না আমি? বিশেষ করে সে যদি আপনার মত অপূর্ব সুন্দরী হয়!'

হাত ব্যাগ থেকে একটা পুরানো সোনার হাত ঘড়ি বের করল নাদিরা। মুখে লজ্জা পাওয়া হাসি। বেশ ভারি জিনিসটা। 'এই যে।'

হাতের তালুতে ওটা নাচাল খানিক গার্সিয়া। 'ভেতরে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারি?' বুড়ো আঙুল বাঁকা করে কাঁধের ওপর দিয়ে ভল্ট রূমের বন্ধ দরজা দেখাল সে।

'অবশ্যই।'

'আপনি বসুন, প্লীজ।' ঢুকে পড়ল লোকটা ভল্ট রূমে, লাগিয়ে দিল দরজা।

বসে আবার চারদিক নজর বোলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল নাদিরা। জিনিসটা চোখে আগেও পড়েছে, আবারও দেখল ভাল করে। ওর বাঁ দিকে প্রায় পুরো দেয়াল জোড়া বিশাল এক আয়না। কি ওটা?

ওয়ান ওয়ে উইণ্ডো? ওপাশ থেকে এপাশের সব দেখা যায়? ওর আচরণ কি লক্ষ করছে গার্সিয়া আড়ালে বসে? অস্বস্তিতে পড়ে গেল নাদিরা। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল।

পাঁচ মিনিট পর বেরিয়ে এল গার্সিয়া। ঘড়িটা দোলাচ্ছে হাতে। 'দারুণ জিনিস। এটার ন্যায্য দাম হয় পাঁচশো, মিথ্যে বলব না আপনাকে। যদি এই দামে বেচতে রাজি থাকেন আপনি... ।'

'আমি রাজি।'

'একসেলেন্ট। আসুন আমার সঙ্গে।'

ক্যাশ থেকে দশটা পঞ্চাশ ডলারের নোট বের করে ওর হাতে তুলে দিল গার্সিয়া। তারপর একটা মানি রিসিপ্টে ঘড়িটার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখে তাতে ওর সই করিয়ে নিল। নাম-ঠিকানা লেখার প্রয়োজন হলে ছদ্ম নাম-পরিচয় দেবে কি না, আসার আগে ভেবেছিল একবার নাদিরা। কিন্তু মাসুদ রানা বাতিল করে দিয়েছে সে আইডিয়া। বিপদ হতে পারে তাতে। গার্সিয়া যদি ওর আইডেন্টিফিকেশন চেয়ে বসে, ঝামেলা হয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আইডেন্টিফিকেশন চাইল না লোকটা।

এরপর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল সে নাদিরাকে। হ্যাণ্ডশেক করল। নাদিরার মনে হলো গার্সিয়া বেশি সময় নিচ্ছে কাজটা করতে গিয়ে। ও মুঠি ছেড়ে দেয়ার পরও নিজের মুঠি খোলেনি ইচ্ছেকৃতভাবেই।

ওর মুখে ঘটনা বিস্তারিত শুনল মাসুদ রানা। তারপর গম্ভীর হয়ে গেল। মনে হলো কোন ভাবনায় পড়ে গেছে।

'কি হলো? কোথাও কোন ভুল করে ফেলেছি?'

'না। তবে দুটো বিষয় ভাবাচ্ছে আমাকে।'

'কি?'

‘এক. লোকটা তোমার আইডেন্টিফিকেশন চায়নি।’

কপাল কোঁচকাল মেয়েটি। ‘তাতে কি?’

‘কি করে সে নিশ্চিত হলো যে জিনিসটা তোমারই?’

‘বুঝলাম না।’ কুঞ্চন আরও বাড়ল তার।

‘জিনিসটা চোরাই মালও তো হতে পারত।’

‘কি যা তা বকছ! আমাকে দেখে কি চোর মনে হয়?’

হেসে ফেলল মাসুদ রানা। ‘আমি চোর না ডাকাত, লেখা আছে আমার গায়ে? না কারও থাকে?’

‘ওহ্! কামন, রানা। আমি মিঙ্ক পরে...’

‘ওটাও তো চোরাই হতে পারে। তা-ও নয়, আমি আসলে অন্য কথা ভাবছি। রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সের মত নামকরা জুয়েলারি বিক্রেতা কেন পুরনো জিনিস কেনা-বেচা করবে? ব্যাপারটা বেখাপ্পা লাগছে আমার।’

‘হয়তো ওসব জমানো লোকটার হবি। হতে পারে না?’

চুপ করে গালে হাত বোলাতে লাগল মাসুদ রানা।

‘জিনিসটার অ্যান্টিক ভ্যালুও তো কম নয়,’ আবার বলল নাদিরা।

‘তাই বলে পাঁচশো ডলার? একটু বেশি হয়ে গেল না?’

‘হ্যাঁ...,’ আমতা আমতা করতে লাগল ও। ‘দাম একটু বেশিই দিয়ে ফেলেছে লোকটা।’

‘সেটাই তো প্রশ্ন, বেশি কেন দেবে? পুরনো জিনিস কেনা-বেচা যখন করে সে, কোনটার কি দাম হতে পারে, অবশ্যই তার জানার কথা। কাজেই বেশি কেন দেবে?’

আরও আছে। মাফিয়ার ডনের ছেলে, ব্যবসা যত বড়ই হোক, সারাক্ষণ দোকান আগলে বসে থাকবে কর্মচারীর মত, ব্যাপারটা একেবারেই বেমানান। ব্যাটা নড়েই না দোকান ছেড়ে,

কেন? আর কোন কাজ নেই নাকি গার্সিয়ার? শুধুই গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সের ব্যবসা? উঁহুঁ! মানায় না।'

খানিক ভাবল নাদিরা প্রশ্নটা নিয়ে। তারপর মাথা দোলাল। 'কি জানি!'

দু'দিন পরের কথা।

সন্ধে পাঁচটা পঁচিশ। অ্যাভিনিউ ফিফটি ফিফ্‌থ্‌। দূর থেকে গার্সিয়া এবং তার সঙ্গীদের বেরিয়ে আসতে দেখে প্যাসেঞ্জারস ডোর মেলে ধরল রানা। 'জলদি যাও। বেরিয়ে পড়েছে।'

গাড়ি থেকে নামল নাদিরা। রানার দিকে তাকিয়ে এক টুকরো আড়ষ্ট হাসি দিল। তারপর পা বাড়াল রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সের দিকে। ঠিক সময়মতই বেরিয়েছিল ও গাড়ি থেকে। অ্যালার্ম সুইচ টিপে নিজের গাড়িতে উঠতে যাবে গার্সিয়া, তখনই নাদিরার ওপর চোখ পড়ল তার। মাথা নিচু করে হেঁটে যাচ্ছে সে। অন্যমনস্ক।

'আরে! মিস্ নাদিরা?' খুশি খুশি গলায় বলল লোকটা। সঙ্গীদের প্রত্যেকে ঘুরে তাকাল ওর দিকে। 'আপনি? কোথায় চললেন একা একা?'

থেমে দাঁড়িয়ে গার্সিয়ার মুখের দিকে চেয়ে থাকল নাদিরা। যেন চিনতে পারেনি।

অবাক হলো মানুষটা। 'আমি গার্সিয়া! রবার্টো গার্সিয়া!'

মৃদু হাসি ফুটল নাদিরার ঠোঁটের কোণে। 'দুঃখিত। চিনতে পারিনি।'

'ব্যাপার কি?' একটু যেন হোঁচট খেলো গার্সিয়ার হাসি। 'খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে! অবশ্য প্রশ্ন করা যদি অনধিকার চর্চা না হয়ে...'

'না, না, তেমন কিছু নয়।'

'ওদিকে কোথায় চললেন?'

'পার্ক অ্যাভিনিউ।'

'রিয়েলি? আমিও যাচ্ছি ওদিকে। চলুন না, পৌঁছে দিই আপনাকে?' পেভমেন্ট ঘেঁষে অপেক্ষমাণ নিজের প্রকাণ্ড লিমুজিন দেখাল গার্সিয়া।

ইতস্তত করতে লাগল নাদিরা। 'আপনারা… আপনাদের…।'

'কিচ্ছু অসুবিধে নেই, আসুন। উঠুন। এরা সবাই যাচ্ছে না আমার সঙ্গে।' পিছনের দরজা মেলে ধরল সে। সঙ্গী দুই সেলসম্যানের উদ্দেশে ইটালিয়ানে দ্রুত কণ্ঠে কিছু বলল। খানিক দ্বিধায় ভুগল ওরা, তারপর ট্যাক্সি চেপে চলে গেল।

মাঝে ভদ্র দূরত্ব রেখে পিছনের সীটে বসল নাদিরা ও রবার্টো গার্সিয়া। গাড়ি স্টার্ট দিল দোকানের গার্ড-কাম-গার্সিয়ার বডিগার্ড-কাম-শোফার।

'হঠাৎ করে আপনাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি,' বলল ইটালিয়ান। 'মিস্টার কার্নি কেমন আছেন?'

চেহারা গম্ভীর করে তুলল নাদিরা। 'ঠিক জানি না। দেখা নেই বেশ কয়েকদিন।'

'বুঝেছি,' হেসে উঠল লোকটা। 'নিশ্চই ঝগড়া করেছেন দু'জনে?'

উত্তর দিল না ও। তবে মুখের ভাবে বুঝিয়ে দিল তার ধারণাই ঠিক।

'দুঃখিত। না জেনে আপনাকে কষ্ট দিলাম বোধ হয়।'

'না। ঠিক আছে।' এই প্রথম মানুষটাকে ভাল করে লক্ষ করল নাদিরা। গরিলার মত স্বাস্থ্য তার, বুকটা পঞ্চাশ গ্যালনি ব্যারেলের মত। চেহারা আকর্ষণীয়, মোটামুটি। তবে সারা মুখে

অসংখ্য ছোট-বড় দাগ কাটাচেরার। দৃঢ় চোয়াল। ঝকঝকে সাদা সুগঠিত দাঁত। আন্তরিক হাসি যখন হাসে, মন্দ লাগে না দেখতে।

'...একটা বার আছে। দু'চার মিনিট জিরিয়ে নেয়া আর কি। অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে।'

সচকিত হলো নাদিরা । 'দুঃখিত, কিছু বলছিলেন?'

গভীর দৃষ্টিতে দেখল ওকে গার্সিয়া। 'পার্ক অ্যাভিনিউতে একটা ফান বার আছে। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, ওখানে বসতে চাই কয়েক মিনিটের জন্যে।'

একটু চিন্তার ভান করে রাজি হয়ে গেল নাদিরা। 'ঠিক আছে। তবে বেশিক্ষণ বসতে পারব না।'

'ধন্যবাদ।'

প্রথমে সঙ্গে আনা প্যাকেটটা ব্যাঙ্কের নাইট ডিপোজিটে ঢোকাল গার্সিয়া, তারপর একটা বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে নিয়ে এল নাদিরাকে। খুদে একটা কেবিনে বসল মুখোমুখি। চোখের কোণ দিয়ে নাদিরা লক্ষ করেছে, গার্সিয়ার শোফারও এসেছে পিছন পিছন। কেবিনের দরজার চার হাতের মধ্যেই বসেছে সে। নজর রাখছে চারদিক।

'বলুন, কি খাবেন?'

'সফট ড্রিঙ্ক।'

'ওহ্!' একটা ভুরু তুলল গার্সিয়া। বেয়ারা ডেকে নিজের জন্যে মার্টিনি এবং নাদিরার জন্যে ঠাণ্ডা কোকের অর্ডার দিল।

লোকটা যে একজন হেভি ড্রিঙ্কার, ব্যাপারটা আবিষ্কার করতে খুব একটা সময় লাগল না নাদিরার। ওর কোক অর্ধেকও শেষ হয়নি, অথচ লোকটা এরই মধ্যে তৃতীয় গ্লাসে সিপ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। তারপরও ভেতরে মাতলামির সামান্যতম আভাস নেই। যেন পানি খাচ্ছে। তবে অল্প হলেও টের পাওয়া যায়,

একটু একটু করে বাচাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে সে।

এটা-ওটা নানান প্রসঙ্গ নিয়ে গল্প করে যাচ্ছে। বেশ গল্পবাজ মানুষ, সমান ওস্তাদ চুট্‌কি বলায়। খেয়াল রেখেছে নাদিরা, লোকটার তরফ থেকে কোন নোংরা ইঙ্গিত আসে কি না। কিন্তু না, সেরকম কোন আভাস নেই। টেবিলের তলায় ইচ্ছে করে হাঁটুতে হাঁটুতে ঘষা লাগানো, কোন কারণ তৈরি করে হাত স্পর্শ করা, বা দুর্ঘটনাবশত হুমড়ি খেয়ে গায়ের ওপর পড়া, কিচ্ছু না। জাতে মাতাল হলেও ব্যাটা তালে ঠিক আছে।

আরও কয়েক মিনিট সময় নিল নাদিরা, তারপর তার ব্যবসার প্রসঙ্গ তুলল আলগোছে। মনে হলো যেন খুশিই হয়েছে লোকটা। প্রফেসরী ভঙ্গীতে জ্ঞানদান করতে শুরু করল ওকে। কি করে ডায়মণ্ডের মূল্য নির্ধারণ করতে হয়, কোথায় ডায়মণ্ড কাটিঙের মূল সেন্টার, ডায়মণ্ড ব্যবসায়ে ইসরাইলীদের গুরুত্ব কতখানি, স্যাফায়ার, রুবি আর এমারেল্ডের তুলনায় ডায়মণ্ডে লাভ কত পার্সেন্ট বেশি ইত্যাদি একনাগাড়ে বলে যেতে লাগল গার্সিয়া।

'ডায়মণ্ডের ওপর আপনার আগ্রহ খুব বেশি মনে হচ্ছে!'

'উঁম...ওয়েল, হ্যাঁ। তা বলতে পারেন। ওই জিনিসের অ্যান্টিক ভ্যালু বেশ চড়া। ঐতিহাসিক মূল্যও আছে ডায়মণ্ডের। এটা অমুক দেশের রানীর, ওটা অমুক ডাচেসের বা হয়তো কোন আরব শেখের স্ত্রীর,' একটা চোখ টিপল গার্সিয়া। 'সে সব সংগ্রহের মজাই আলাদা। আপনি যদি সংগ্রাহক না হন, বললেও বুঝবেন না। ডায়মণ্ডের কাটিং, রং, ওজন, ব্রিলিয়ান্স ইত্যাদি আরও অনেক কিছু আছে, যা চিনতে সামান্য ভুল হলেই বারোটা বেজে যাবে।'

চতুর্থ রাউণ্ড শুরু করল ইটালিয়ান। 'তবে ইনডিভিজ্যুয়াল স্টোনও মন্দ নয়। ওগুলো হয় খুব ছোট, সহজেই লুকিয়ে রাখা

যায়। নিরাপত্তার ব্যাপারটা নিয়ে মাথা কম ঘামালেও চলে। হয়তো তড়িঘড়ি কোন কারণে দেশত্যাগ করতে হলো আপনাকে, ওগুলো সঙ্গে নিতে কোন বেগ পেতে হবে না। এখন আবার নতুন কায়দা শুরু হয়েছে। লাখ লাখ ডলার দামের পাথর সোনা বা রূপোর কম দামী চেইনের সঙ্গে জুড়ে বিক্রি হচ্ছে। দেখলে কেউ কল্পনাই করতে পারবে না ওরকম সস্তা চেইনে কেউ এত দামী পাথর সেট করতে পারে। এই তো, গতকালই নাম করা এক নায়িকার কাছে এরকম একটা পেনড্যান্ট বিক্রি করেছি আমি। তার নাম অবশ্য বলব না, বিজনেস সিক্রেট। চেইনের দাম পড়েছে মাত্র তিনশো, সঙ্গে সেট করা ডায়মণ্ডের দাম দুই মিলিয়ন।'

'মাই গড!'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এতে লাভ কি?'

'লাভ একটাই, চোরকে নিরুৎসাহিত করা। একটা ড্যাম চীপ চেইনে অমন মূল্যবান পাথর সেট করা হয়েছে, তা বোঝার ক্ষমতা ওদের নেই। অবশ্য সে যদি সত্যি চোর হয়ে থাকে। পাথর বিশেষজ্ঞ হলে অন্য কথা।' থামল গার্সিয়া। বুঝল, ওর ভাষণ শুনছে না মেয়েটি, অন্য কোন ভাবনায় ডুবে আছে সে। 'আপনার মনটা বোধ হয় ভাল নেই আজ,' সহানুভূতির সঙ্গে বলল ইটালিয়ান।

এবারও সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গেল নাদিরা। 'যদি কিছু মনে না করেন, এবার উঠব আমি।'

'নিশ্চই নিশ্চই! কোথায় যাবেন, বলেন তো পৌঁছে দিয়ে আসি?'

'না, ধন্যবাদ। একাই যেতে পারব আমি।'

‘অল্ রাইট।’

পাঁচ

ম্যানহাটনের একটা লার্জ-স্কেল ম্যাপ সামনে বিছিয়ে নিয়ে বসে আছে মাসুদ রানা। তার ওপর সাদা কাগজে লাল কালিতে আরেকটা হাতে আঁকা ম্যাপ—ইস্ট ফিফটি ফিফথ্ স্ট্রীটের, নিজ হাতে এঁকেছে রানা।

ব্লকের সবকিছু বিস্তারিত দেখিয়েছে ও এটায়। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড, বাস স্টপেজ, নো-পার্কিং জোন, নির্মাণাধীন একটা বহুতল ভবন, ট্রাফিক সিগন্যাল পোস্ট, দোকান, হোটেল-রেস্তোরাঁ, অফিস বিল্ডিং ইত্যাদি কিছুই বাদ দেয়া হয়নি। অনেক সময় নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ম্যাপটা পর্যবেক্ষণ করল মাসুদ রানা। অবশেষে মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্ট মনে। আরেকটা কাগজ টেনে নিয়ে শিডিউল তৈরি করতে বসল এবার।

কখন শুরু করবে, এখনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি ও। সেটা অবশ্য পরে করলেও চলবে। তবে পুরো অপারেশন যেহেতু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে হতে হবে, তাই শিডিউল একটা এখনই না করলেই নয়। জায়গা মত পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে, কোথায় গাড়ি দাঁড় করাতে হবে, কাজ সারতে কত সময় ব্যয় করা যাবে, তারপর পিঠটান ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল মাসুদ রানা।

চার ভাগে ভাগ করল ও অপারেশনটাকে। প্রিপারেশন, অ্যাডভান্স, অ্যাসল্ট এবং উইথড্রল। সকাল দশটায় অ্যাডভান্স ধরে গাড়ি পার্ক করার সময়, গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সে পৌঁছতে

স্বাভাবিকভাবে যে সময় লাগে, তার সঙ্গে ট্রাফিক জ্যাম বা আর কোন কারণে কিছুটা দেরি হয়ে যেতে পারে ধরে আরও পাঁচ মিনিট যোগ করে সময় নির্ধারণ করল ও। বাকি থাকল অ্যাসল্ট ও উইথড্রল। অ্যাসল্টের জন্যে চল্লিশ মিনিট ধরে নিল রানা। তারপর...।

রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্স।

কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল নাদিরা। এক সেলসম্যানের সঙ্গে কিছু আলাপ করছিল গার্সিয়া, ওকে দেখে বিস্মিত হলো। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটিয়ে। 'ওয়েলকাম!' বলেই চোখ কোঁচকাল সে। 'আপনার মুখ শুকনো কেন লাগছে? কোন সমস্যা?'

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল মেয়েটি। 'বসতে পারি?'

'এ কোন প্রশ্ন হলো? একশোবার বসতে পারেন। আসুন।' কাস্টমারদের জন্যে নির্ধারিত স্থানে তাকে নিয়ে বসাল লোকটা সাদরে। নিজেও বসল পাশে। 'বলুন, কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

হাত ব্যাগ থেকে কয়েকদিন আগে কেনা এনগেজমেন্ট রিংটা বের করল নাদিরা। 'এটা বিক্রি করব আমি।'

'সে কি!' চমকে উঠল গার্সিয়া। 'কেন? এটা তো...'

'ওর কোন স্মৃতি রাখতে চাই না আমি,' গলায় কাঠিন্য ফুটিয়ে বলল নাদিরা। 'সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে আমাদের।'

কয়েক মুহূর্ত থ মেরে থাকল গার্সিয়া। চোখ বড় বড় করে নাদিরাকে দেখল। 'শুনে খুব দুঃখ পেলাম। সেদিনই বুঝেছিলাম, কিছু একটা ঘটেছে আপনাদের মধ্যে। কিন্তু ব্যাপার যে এতদূর গড়িয়েছে কল্পনাই করিনি আমি। আপনি...আপনি শিওর? বিক্রি

করবেনই?'

'মোর দ্যান শিওর। প্লীজ! এ নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করবেন না।' মুখের ভাব দেখে মনে হলো এখনই কেঁদে ফেলবে নাদিরা।

ব্যস্ত হয়ে উঠল গার্সিয়া। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে! সরি, আর কোন প্রশ্ন করব না আমি।' হাত পাতল সে। 'দিন ওটা।' জিনিসটা এক সেলসম্যানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে কিছু বলল লোকটা নিজের ভাষায়। তারপর নাদিরার কাছে ক্ষমা চেয়ে পিছনের রূমে গিয়ে ঢুকল। এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল টাকা নিয়ে। 'গুণে নিন। পুরো সাড়ে চার হাজার আছে।'

'প্রয়োজন নেই।' টাকাটা ব্যাগে রেখে আসন ছাড়ল নাদিরা। 'চলি। ধন্যবাদ।'

'সে কি! এখনই?'

'কাজ আছে,' ক্ষমা প্রার্থনার হাসি দিল নাদিরা।

'নিশ্চই আছে। কিন্তু তাই বলে এখনই যাবেন? অন্তত এক কাপ কফি খেয়ে যান।' বলতে বলতে কোট গায়ে চাপাল লোকটা। 'চলুন, রাস্তার ওপারে একটা রেস্তোরাঁ আছে, ওখানে গিয়ে বসা যাক।' নাদিরাকে আর কথা বাড়াবার সুযোগ দিল না সে, প্রায় জোর করেই নিয়ে এল রাস্তার এপারে। অন্তত গার্সিয়ার সেরকমই ধারণা।

রাস্তার দিকের জানালা ঘেঁষা একটা টেবিলে মুখোমুখি বসল ওরা। 'বলুন, কফির আগে কি?'

'আর কিছু না। শুধু কফি, প্লীজ!'

পর পর দু'কাপ করে কফি খেল ওরা। এর মধ্যে জমিয়ে ফেলেছে গার্সিয়া দু'জনের আসর। নানান চটুল গল্পে মনের 'বোঝা হালকা' করে দিয়েছে নাদিরার অনেকটা। এক ঘণ্টা কাটাল ওরা রেস্তোরাঁয়। এর মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে

দু'জনে। ওঠার আগে নাদিরার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিল গার্সিয়া, আগামী বৃহস্পতিবার তার সঙ্গে ডিনার করবে সে।

রানা এজেন্সি।

গভীর রাত। ভেতরের এক কক্ষে জরুরি মীটিং বসেছে। তাতে উপস্থিত আছে মাসুদ রানা, নাদিরা, এজেন্সির নিউ ইয়র্ক চীফ শওকত, এবং রানার বাছাই করা পাঁচজন এজেন্ট। মুত্তাকিম বিল্লাহ, ফয়েজ আহমেদ, সবুজ, বিপুল ও হাসান। আধ ঘণ্টা আগে সবার অলক্ষে, পিছনের গেট দিয়ে গোপনে এসেছে রানা ও নাদিরা।

শেষ পাঁচজনের প্রথমজন ছয় ফুট দু'ইঞ্চি দীর্ঘ ছোটখাট এক দানব। বয়স বত্রিশ। মুখটা লম্বাটে, চেহারা হাবাগোবা গোছের। অসুরের শক্তি বিল্লাহর দেহে। কারাতের ব্ল্যাক বেল্ট হোল্ডার সে। শূটিঙেও সমান ওস্তাদ। পরিস্থিতি যা-ই হোক, ভয় কি বস্তু জানে না মুত্তাকিম বিল্লাহ।

ফয়েজ আহমেদ ঠিক তার উল্টো। দৈর্ঘ্য বড়জোর পাঁচ ফুট ছয়। ঘাটতিটা প্রস্থে পুষিয়ে দিয়েছে প্রকৃতি। বুকের ছাতি পুরো বেয়াল্লিশ ইঞ্চি। ঘন কালো লোমে ভর্তি ফয়েজের সারা শরীর। প্রকাণ্ড থ্যাবড়া মুখ। বিজেএমসির হেভিওয়েট বক্সার ছিল এক সময়। গলার স্বর চিকন, প্রায় মেয়েলী। গল্পবাজ মানুষ। বয়স পঁয়ত্রিশ। অন্য তিনজন কম বয়সী, বিশ থেকে বাইশের মধ্যে। হালকা-পাতলা গড়ন প্রত্যেকের। হাসান লাজুক চেহারার ছেলে, কথা বলে কম। কাজে ওস্তাদ এবং দুঃসাহসী। বিপুল করিৎকর্মা। এখানকার অপরাধ জগতের সবাইকে মোটামুটি চেনে সে। নাম শুনেই বলে দিতে পারে কে কোন ক্ষেত্রে হাফেজ। সবুজ নির্ভীক, 'কথা কম, কাজ বেশি' নীতিতে বিশ্বাসী। তুলনামূলক কম বয়সী

বলে এদের তিনটির গলায় গলায় সম্পর্ক। ফয়েজ ঠাট্টা করে নাম রেখেছে এদের ত্রিরত্ন। চীফ শওকত মাঝারি গড়নের মানুষ। চেহারা বুদ্ধিদীপ্ত। গালে চাপদাড়ি। পুরু কাঁচের চশমা পরে। ইন্টেলেকচুয়ালদের মত চেহারা। বয়স আটাশ।

একে নিজের অপারেশন পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করেনি মাসুদ রানা। তবু মীটিঙে থাকতে বলেছে, কারণ লোকাল চীফ হিসেবে পুরোটা তার জানা প্রয়োজন। হোক তা আনঅফিশিয়াল।

আধ ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিল মাসুদ রানা। শেখ জাবের আল উবায়েদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, তাঁর হবি, উপসাগরীয় যুদ্ধের পটভূমিতে লোট্টি ও মারা চড়ে তাঁর পালাবার প্রচেষ্টা, জাহাজ আক্রমণ এবং সবশেষে তাঁর মৃত্যু ও উধাও হয়ে যাওয়া রত্ন ভাণ্ডার সম্পর্কে জানাল রানা ওদের। প্রতিকার হিসেবে কি করতে চায় সেটাও বলল।

এক সময় বক্তৃতা শেষ হলো মাসুদ রানার। নীরবতা পাথরের মত চেপে বসল রূমের ভেতর। দীর্ঘ সময় কথা বলল না কেউ। সবাই চুপ।

'কারা করেছে এ কাজ?' প্রথম প্রশ্ন করল দানব, মুত্তাকিম বিল্লাহ।

'মাফিয়া।'

'মাফিয়া!' বিস্ময় প্রকাশ করল গরিলা, ফয়েজ আহমেদ।

'হ্যাঁ। পাওলো গার্সিয়ার সুপুত্র রবার্টো গার্সিয়া ঘটিয়েছে এ কাজ। নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে।'

সোজা হয়ে গেল হাফেজ বিপুল। 'ডন গার্সিয়া?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা।

'রবার্টো গার্সিয়া, মানে ইস্ট ফিফটি ফিফথ স্ট্রীটে যার জুয়েলারি শপ আছে?'

‘হ্যাঁ।’

‘আচ্ছা!’ ঘোঁৎ করে উঠল বিল্লাহ।

কি ভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে লোকটা, জানাল রানা ওদের। ঘটনাটা কি ভাবে ফাঁস হয়েছে, ও জানতে পেরেছে, তাও ব্যাখ্যা করল। সবশেষে যোগ করল, ‘ওগুলোর কিছু কিছু এর মধ্যে বিক্রি করে ফেলেছে গার্সিয়া। বাকিগুলো আছে তার দোকানের ভল্টে। জিনিসগুলো উদ্ধার করতে হবে যে কোন মূল্যে।’

নীরবে নাদিরার দিকে হাত বাড়াল মাসুদ রানা। হাতব্যাগ থেকে একটা নেকলেস আর এক জোড়া ইয়ার রিঙ বের করল মেয়েটি, তুলে দিল ওর হাতে। ‘শেখ জাবেরের সংগ্রহের মধ্যে এই সেটটাও ছিল। তাঁর হত্যাকাণ্ডের কয়েক মাস পর এক বান্ধবীর চাপাচাপিতে পড়ে রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সে যেতে হয়েছিল নাদিরাকে, বান্ধবীর জন্যে নেকলেস আর ইয়ার রিঙের একটা সেট পছন্দ করে দেয়ার জন্যে।

‘তখনই জানা যায় যে ওই দোকানেই রয়েছে শেখ জাবেরের ছিনতাই হওয়া অমূল্য সংগ্রহের অনেকগুলো। এই সেট তার মধ্যে একটা।’ ওই দোকান থেকেই কেনা হয়েছে। সেটটা প্রথমে মুত্তাকিম বিল্লাহর হাতে তুলে দিল রানা। ‘উল্টোদিকে খুব সূক্ষ্ম একটা ঘষার দাগ আছে দেখো। ভাল করে না তাকালে বোঝা যায় না।’

নেকলেসের মাঝামাঝি জায়গায়, যেখান থেকে বড় এক খণ্ড আঠারো ক্যারেটের নাশপাতি আকারের ডায়মণ্ড ঝুলছে, তার ঠিক পিছনেই চেইনের গায়ে একটা দাগ দেখতে পেল বিল্লাহ। ঘষাঘষির কোন চিহ্ন যাতে না থাকে, সে জন্যে চেষ্টা করা হয়েছে বোঝা যায়। তারপরও সামান্য দাগ রয়েই গেছে। অবশ্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না তাকালে ঠাহর করা মুশকিল।

মাথা দোলাল বিল্লাহ। 'দাগটা কিসের, মাসুদ ভাই?' জিনিস দুটো ফয়েজের হাতে দিল সে। এক পলক দেখে ওটা শওকতের হাতে তুলে দিল ফয়েজ।

'নিজের প্রতিটি সংগ্রহে বিশেষ এক ধরনের অমোচনীয় কালি দিয়ে সীল বসিয়ে দিতেন শেখ জাবের, তার দাগ। দাগটা তুলে ফেলা হয়েছে।'

'হুঁম!' বলল ফয়েজ।

'নানার সংগ্রহের প্রায় সব অলঙ্কার সেটই চেনা আছে নাদিরার। বান্ধবীর জন্যে যেদিন ওই দোকানে গিয়েছিল, সেদিন এরকম মোট নয়টা সেট দেখেছে ও। প্রত্যেকটার সীল তুলে ফেলা হয়েছে। কয়েকদিন আগে আমিও গিয়েছিলাম রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সে, আমিও দেখেছি এক সেট।

'প্রশ্ন উঠতে পারে প্রমাণ যখন পাওয়াই গেছে, পুলিসকে কেন জানানো হচ্ছে না? উত্তরটাও সোজা। এখানকার মাফিয়া পরিবারগুলোর মধ্যে গার্সিয়া পরিবার অত্যন্ত প্রভাবশালী। ডন পাওলো গার্সিয়ার ব্যক্তিগত প্রভাবও প্রচুর। পুলিস, এফবিআই নিয়মিত পয়সা পায় তার কাছ থেকে। অতএব ওদের জানানো হলে খবরটা লিক আউট হতে পারে, জেনে যেতে পারে রবার্টো। সে ক্ষেত্রে মালপত্র সরিয়ে ফেলবে সে। হানা দিলে পাওয়া যাবে না কিছুই। বরং মাঝখান থেকে নাদিরার প্রাণের নিরাপত্তা থাকবে না কোন। কাজেই...'

'চোরের ওপর বাটপারি করতে হবে,' বক্তব্য শেষ করল হেভিওয়েট বক্সার।

'ঠিক। ওই দোকানের ভল্ট খালি করে ফেলতে চাই আমি।'

'গুড!' সন্তুষ্ট দেখাল বিল্লাহকে। কাজটা পছন্দ হয়েছে ওর।

'তবে এ প্রসঙ্গে আরেকটা কথা,' বলল মাসুদ রানা।

'অফিশিয়াল কোন অ্যাসাইনমেন্ট নয় এটা। আগেই বলেছি ভদ্রলোক আমার বসের বন্ধু ছিলেন, যে কারণে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সুরাহা করার দায়িত্ব আমি কাঁধে নিয়েছি। আপাতদৃষ্টিতে সিরিয়াস মনে না হলেও পরে সিরিয়াস হয়ে উঠতে পারে ব্যাপারটা। ঘটে যেতে পারে অনেক কিছু। কাজেই তোমরা কেউ যদি জড়িত হতে না চাও এর সঙ্গে, কোন অসুবিধে নেই। সরে পড়তে পারো। বাধ্যবাধকতা নেই কোন রকম।'

পুরো এক মিনিট কেটে গেল নীরবে। কেউ কোন কথা বলল না। অবশেষে মুখ খুলল সবুজ, 'কখন চড়াও হচ্ছি আমরা গার্সিয়ার বাচ্চার ঘাড়ে?'

'দেরি করা ঠিক হবে না তাহলে,' বলল ফয়েজ। 'মাসুদ ভাই, প্ল্যান-ট্যান করে ফেলা ভাল।'

মুত্তাকিম কোন কথা বলছে না দেখে তার দিকে তাকাল রানা। নিজের মুখের ওপর বসের সন্ধানী দৃষ্টি অনুভব করল সে। তবু মুখ তুলল না। নেকলেসটা সবুজের হাত ঘুরে তার কাছে ফিরে এসেছে আবার। ওটা দোলাতে দোলাতে বলল সে, 'অনেকদিন ধরে প্রায় বসে বসে অকাজে বেতন নিচ্ছি, মাসুদ ভাই। হাত-পায়ে শিকড় গজিয়ে যাওয়ার অবস্থা। এইবার মনে হচ্ছে ব্লাড সার্কুলেশন কিছুটা বাড়বে।'

'তোমরা? বিপুল, হাসান?'

'অ্যাকশনের গন্ধ পাচ্ছি আমি, মাসুদ ভাই,' বলল বিপুল। 'রোমাঞ্চ অনুভব করছি।'

'আমিও,' বলল হাসান।

'অল রাইট,' মুচকে হাসল রানা। জানত, পিছিয়ে যাওয়ার বান্দা নয় এরা কেউ। 'এবার তাহলে প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করা যায়,' বিল্লাহর বাড়ানো হাত থেকে সেটটা নিয়ে নাদিরাকে দিল

মাসুদ রানা। 'গত এক সপ্তা ধরে দোকানটার ওপর চোখ রেখেছি আমি। ওটা কখন খোলে, কখন বন্ধ হয়, কতজন স্টাফ আছে দোকানের, মোট কথা খুঁটিনাটি সবকিছু সতর্কতার সাথে লক্ষ করেছি। প্রথমে প্ল্যান করেছিলাম সকাল দশটার সময়, ঠিক যখন খোলে ওটা, তখনই অপারেশন শুরু করব। কিন্তু পরে সে ভাবনা বাতিল করে দিয়েছি। ঝুঁকি আছে ওতে। হঠাৎ যদি কোন স্কোয়াড কার হাজির হয়, বা কোন টহল পুলিস এসে পড়ে অথবা যদি দোকান খোলার সাথে সাথেই ঢুকে পড়ে এক দল খদ্দের, বরবাদ হয়ে যাবে সব।

'মানুষ আমরা মাত্র ছয়জন। ভল্ট খালি করা, কর্মচারীদের পাহারা দেয়া, সঙ্গে যদি দুয়েকজন খদ্দের থাকে, তাদেরকে সামাল দেয়া, অসম্ভব। তাই পরে ঠিক করেছি, সকাল ন'টায় শুরু করব আমরা অভিযান।'

'গভীর রাতে...' রানাকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল সবুজ।

'রাতে কিছু করতে যাওয়া একেবারেই ঠিক হবে না। কারণ এ ধরনের স্টোরের নাইট সিকিউরিটির ব্যবস্থা খুব কঠোর থাকে। সাইলেন্ট অ্যালার্ম থাকে, দোকানের ভেতর হয়তো বাজবে না, বেজে উঠবে পুলিস স্টেশনে অথবা প্রাইভেট কোন সিকিউরিটি এজেন্সির অফিসে। কিছু টের পাওয়ার আগেই বাইরে থেকে ঘেরাও হয়ে যাব আমরা, ধরা পড়ে যাব।'

'তাহলে?' নড়েচড়ে বসল ফয়েজ।

'এমন এক জিনিসের সন্ধান আমি পেয়েছি, যার সাহায্যে দিনের বেলাতেই নিশ্চিত সাফল্য আসবে। আসবেই।'

'জিনিস?' গলা সামনে বাড়াল বিল্লাহ ইঞ্চি তিনেক।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'জিনিস। ক্লিনিং ট্রাক।'

বিহ্বল দেখাল সব ক'টা মুখ। 'ক্লিনিং ট্রাক?' বলল সবুজ। 'ওটা কিভাবে সাহায্যে লাগবে আমাদের?'

'ওটাই করবে আসল কাজ। এক নাগাড়ে পাঁচ দিন লক্ষ করেছি আমি, সকাল ঠিক ন'টায় একটা প্রাইভেট ক্লিনিং এজেন্সির গাড়ি এসে দাঁড়ায় গার্সিয়ার দোকানের সামনে। ভ্যাকিউম ক্লিনার, ঝাড়ন ইত্যাদি নিয়ে ইউনিফর্ম পরা দুজন লোক নামে ওটা থেকে, ভেতরে গিয়ে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে সাফ-সুতরো করে।

'গাড়িটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালে গার্সিয়া নিজে গেট খুলে ওদের ভেতরে ঢোকায়। এবং লোক দুটো ঢোকামাত্র আবার লাগিয়ে দেয় গেট।'

'রোজ সকালে?' টেবিলে দুই কনুই রেখে ঝুঁকে বসল শওকত। অতি আগ্রহে চকচক করছে দু'চোখ। অন্যদের অবস্থাও একই রকম মনে হলো রানার।

'হ্যাঁ, রোজ সকালে। একদিনও বাদ যেতে দেখিনি।'

'কোন কোম্পানির ট্রাক, মাসুদ ভাই?' বলল সবুজ।

'বনোমো ক্লিনিং সার্ভিস। দোকানের সামনে ডবল পার্ক করে ট্রাকটা। পিছনের পাল্লা খুলে নেমে আসে দুই ক্লিনার। ওদিকে গাড়ির অপেক্ষায় গ্লাস ডোরের ওপাশে নিজে দাঁড়িয়ে থাকে গার্সিয়া। ওদের ভেতরে ঢুকিয়েই আবার লক্ করে দেয় দরজা।'

'ওই ট্রাক হাইজ্যাক করতে হবে!' উল্লসিত হয়ে উঠল মুত্তাকিম। 'ইয়াল্লা! ব্লাড সার্কুলেশন দেখছি এখনই বেড়ে গেছে।'

'দেখো!' সতর্ক চোখে ওকে দেখল হেভিওয়েট, 'আনন্দের ঠেলায় প্রেশার হাই করে বোসো না যেন সময়মত। পালাবার সময় এমনিতেই বোঝা কম থাকবে না, তার ওপর যদি...' দানবকে কটমট করে তাকাতে দেখে থেমে গেল সে। 'দুঃখিত।'

'কিন্তু, মাসুদ ভাই, গাড়ির ব্যবস্থা না হয় করা গেল, কিন্তু

ক্লিনার? যতই ইউনিফর্ম পরা হোক, চেহারা দেখলেই তো গার্সিয়া টের পেয়ে যাবে গোলমালটা,’ বলল বিল্লাহ।

‘না, তা হবে না। সেদিকেও লক্ষ ছিল আমার। ক্লিনারদের চেহারা দেখে না গার্সিয়া, দেখে শুধু ট্রাকটা পার্ক করেছে কি না। ওটাকে দাঁড়াতে দেখলেই গেট খুলে দেয়। আমিও চিন্তা করেছি বিষয়টা নিয়ে। শুধু গাড়িই দেখে সে, তা থেকে কে নামল দেখে না। মনে হয় নিয়মটা অনেক দিন থেকে চলে আসছে বলে একঘেঁয়েমিতে পেয়ে বসেছে লোকটাকে। বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে ওর যে বনোমোর গাড়ি মানেই ওদের রেগুলার ক্রু-রা এসেছে। তাই তেমন পাত্তা দেয় না। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। ব্যাপারটা এরকম নিয়মিত হয়ে পড়লে প্রত্যেকে কিছু না কিছু ঢিল দিয়েই থাকে।’

‘তাহলে আর চিন্তা কি!’ বলল ফয়েজ আহমেদ।

‘ক্লিনিং ট্রাকটা মাঝারি আকারের,’ বলল রানা, ‘একটা ফুটবল টীম অনায়াসে এঁটে যাবে। অর্থাৎ লোক বেশি হলেও ভাবনা নেই। গার্সিয়া যখন টের পাবে তার রেগুলার ক্লিনিং ক্রু-র পরিবর্তে অন্য কেউ এসেছে, তখন দোকানের ভেতরে থাকব আমরা। ভেতরে যদি তখন এক ডজন মানুষও থাকে, অসুবিধে নেই। গেট লকড্, শাটার নামানো, তার ওপর সময়টাও অসময়। খদ্দেররা জানে দোকান ক’টায় খোলে, কাজেই তখন তাদের হাজির হওয়ার প্রশ্নই আসে না। অতএব...প্রায় পুরো এক ঘণ্টা সময় পাব আমরা।’

‘এক ঘণ্টা,’ বলে মাথা দোলাল মুত্তাকিম। ‘ভল্ট তো কিছুই নয়, এর মধ্যে দোকানের ফার্নিচার থেকে শুরু করে ওয়ালপেপার পর্যন্ত গায়েব করে দেয়া সম্ভব।’

‘হ্যাঁ। খুব সম্ভব।’

‘কিন্তু ধরুন,’ বলল ফয়েজ, ‘যদি এমন হয় অপরিচিত ক্রু দেখে গেট খুলল না হারামজাদা গার্সিয়া, তখন?’

‘সে সম্ভাবনা নেই। বললাম না, ও কারও চেহারা দেখে না। কেবল দেখে ট্রাকটা পার্ক করল কি না। ওটা পার্ক করার সঙ্গে সঙ্গে গেট আনলক্ করে সে। তারপরও, যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেই যে গার্সিয়া ক্রু-দের দিকে তাকায়, মানলাম তাকায়। কিন্তু কোনদিকে? ওদের চেহারার দিকে?’ এদিক-ওদিক মাথা দোলাল মাসুদ রানা। ‘না। তাকায় ওদের ইউনিফর্মের দিকে। সবাই তাই-ই করে, আগে দেখে ইউনিফর্ম, পরে চেহারা।’

মাথা দোলাল ফয়েজ। মেনে নিয়েছে রানার যুক্তি।

‘তারপর,’ আবার শুরু করল রানা। ‘যেই মুহূর্তে গেট খোলা হবে, ফ্রন্ট সীটে যারা থাকবে ট্রাকের, ঝটপট ঢুকে পড়বে ভেতরে। তাদের ঠিক পিছন পিছন ঢুকবে ব্যাক ক্যারিয়ারের অন্যরা। স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা ফাস্ট হতে হবে আমাদের, ওতেই চলবে।’

‘ক’টায় সাধারণত আসে ওই ট্রাক?’ জানতে চাইল ফয়েজ।

‘ঠিক ন’টায়। রাস্তায় প্রচুর মানুষ থাকে ওই সময়। কিন্তু তা নিয়ে চিন্তার কিছুই নেই। তারা দেখবে আমাদের, অবশ্যই। তবে ঠিক আমাদের নয়। বনোমো ক্লিনিং সার্ভিসের কভারলস পরা কয়েকজন ক্লিনিং ক্রু-কে দেখবে। সবার চোখের সামনে দিয়ে রবার্টো গার্সিয়ায় ঢুকব আমরা, সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। কেউ ভাবতেই পারবে না কিছু। ভাববেই বা কেন? রোজই তো একই ব্যাপার ঘটে আসছে ওখানে।

‘কাজেই কোন ঝামেলা হওয়ার আশঙ্কা নেই। স্বাভাবিক ক্লিনিং ক্রু-দের মত আমাদের হাতেও টুলস্ থাকবে, গারবেজ ব্যাগ থাকবে। ভেতরে সময় পাওয়া যাবে এক ঘণ্টা, প্রচুর সময়।

গার্সিয়া সহ অন্যদের প্রথমেই অস্ত্রের মুখে শুয়ে পড়তে বাধ্য করা হবে, কেউ যাতে নায়ক হওয়ার চেষ্টা না করে সেদিকেও কড়া নজর রাখতে হবে।

'কাজ সেরে বেরিয়ে আসার আগে সবাইকে হাত-পা বেঁধে, মুখে রুমাল গুঁজে ফেলে রেখে আসব আমরা। গেটের নিচে বাইরে থেকে রাবারের গোঁজ ঠেসে দেব যাতে অন্তত দু'চার মিনিট সময় ব্যয় হয় দরজা খুলতে। ততক্ষণে ভাগ ভাগ হয়ে দু'দিকে রওনা হয়ে যাব আমরা, একদল ট্রাকে করে, অন্যদল কারে।'

একটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। অন্যদেরও অফার করল। 'এটা হচ্ছে খসড়া প্ল্যান। তবে...আরও কয়েকদিন সময় লাগবে সবকিছু চূড়ান্ত করতে। এবার বলো, প্ল্যান সম্পর্কে কারও কোন দ্বিমত আছে? অথবা কোন পরামর্শ?'

'বনোমো ট্রাক না হয় হাইজ্যাক করা গেল,' বলল সবুজ। 'কিন্তু ওদের কভারলস্? কিভাবে জোগাড় হবে ওগুলো?'

'হয়ে যাবে,' মুচকে হাসল মাসুদ রানা। 'ওরাই সরবরাহ করবে।'

বুঝতে না পেরে চেয়ে থাকল সবাই ওর দিকে।

'আগে ওদের অফিসটা কোথায় খুঁজে বের করতে হবে। তারপর আমি বলে দেব কিভাবে জোগাড় করতে হবে বনোমোর ইউনিফর্ম। তার আগে অবশ্য তোমাদের কাউকে ড্রাই ক্লিনারসের ব্যবসায় নাম লেখাতে হবে।'

'ড্রাই ক্লিনার্স!' চোখ কোঁচকাল বিল্লাহ্। 'কেন?'

উত্তর পাশ কাটিয়ে গেল মাসুদ রানা। 'কোথাও একটা শো-রূম খুলে বসতে হবে তোমাকে।'

'আমাকে?' নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠেকাল সে। তারপর

বোকার মত এর ওর দিকে তাকাতে লাগল। 'মাসুদ ভাই, আমি...'

'আমি হব তোমার সেলস্ প্রমোশন অফিসার,' অমায়িক হাসি দিল রানা। 'আচ্ছা, সেসব পরে হবে। আগে ওদের অফিসের সন্ধান, তারপর চোদ্দ নম্বর ক্লিনিং ভ্যানের সন্ধান। ক্যারিয়ারের দুই দিকে বড় করে লেখা আছে নম্বরটা। ওই একটা গাড়িই রোজ রবার্টো গার্সিয়ায় আসে। অন্তত আমি যতদিন ওয়াচ করেছি, অন্য কোন গাড়ি দেখিনি। কাল থেকে গাড়িটাকে ফলো করবে তুমি, সবুজ। অফিসটা খুঁজে বের করবে।'

'ফোন বুকে পাওয়া যাবে না ওদের ঠিকানা?' বলল ফয়েজ।

'যাবে। কিন্তু আমি যেটা জানতে চাইছি, সেটা হলো ওটার নির্দিষ্ট কোনও রুট আছে কি না, কোন প্যাটার্ন আছে কি না। অফিস থেকে সরাসরি ওই দোকানেই যায় ওটা, না আরও কোথাও যায়। কম করেও দুই তিনদিন ফলো করতে হবে। যদি কোন প্যাটার্ন থেকে থাকে, তাহলে জানতে হবে, গার্সিয়ার দোকানে আসার আগের স্টপেজ কোথায় ওটার। সেক্ষেত্রে অপারেশনের দিন গার্সিয়ার আগের হল্টেজ ত্যাগ করার পর পরই গাড়িটা হাইজ্যাক করব আমরা।'

'ওটার ড্রাইভার আর ক্লিনারদের ছেড়ে দিলে...' থেমে গেল সবুজ রানাকে মুখ খুলতে দেখে।

'আমাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওদের ছেড়ে দেয়ার প্রশ্নই আসে না। সবাইকে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখা হবে পিছনে। কাজ হয়ে গেলে ওদের আর প্রয়োজন হবে না আমাদের, তখন ছেড়ে দেব।'

'আমার একটা প্রশ্ন আছে, মাসুদ ভাই,' বলল ফয়েজ আহমেদ।

'হ্যাঁ, বলো।'

'আপনি বলেছেন, গাড়ি দেখেই গেট খুলে দেয় গার্সিয়া। কিন্তু ধরুন, আমরা যেদিন যাব, সেদিন সে কে এসেছে না দেখে যদি গেট না খোলে? আফটার অল, প্রথমবার বলে একটা কথা আছে।'

'ভাল প্রশ্ন করেছ। ধরা যাক, গেট খোলার আগে তার দেখার ইচ্ছে হলো কে বা কারা এসেছে। দেখবে অপরিচিত দুটো মুখ। সে ক্ষেত্রে কি করবে সে? গেট না খুলেই জানতে চাইবে, তারা কেন এসেছে? তার রেগুলার ক্রু-রা কোথায়?' মাথা দোলাল রানা। 'না। জানতে যদি ইচ্ছে হয়ই গার্সিয়ার, জানতে চাইবে গেট খুলে। কারণ চোখের সামনে সে বনোমোর ট্রাক দেখতে পাচ্ছে, অপরিচিত হলেও খুব চেনা কভারলস্ পরা দুইজন ক্লিনার দেখতে পাচ্ছে, সে ক্ষেত্রে কী এমন সন্দেহ জাগতে পারে তার মনে? এমন কিছু নিশ্চই নয় যে তাদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে বনোমোয় ফোন করে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে তাকে।'

একটু থামল মাসুদ রানা। ভাবল। 'তবু, সন্দেহ যখন জেগেছে, এ ব্যাপারে আরও খোঁজ করে শিওর হয়ে নিতে হবে আমাদের। এই পর্যায়ে এসে কোনরকম ঝুঁকি নেয়া চলবে না। কাল থেকে আরও কয়েকদিন বিশেষভাবে এই ব্যাপারটার ওপর লক্ষ রাখতে হবে। যদি দেখি গেট খোলার আগে ক্রু-দের তেমন লক্ষ করে না লোকটা, তাহলে এই প্ল্যানই কার্যকর করা হবে। তা না হলে অন্য পথ বের করতে হবে। এ কাজে এমনিতেই প্রচুর ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি আমরা, কাজেই নতুন আর কোন ঝুঁকি নেয়া চলবে না।'

উসখুস করল খানিক বিল্লাহ। 'তখন ক্লিনার্সের ব্যাপারে কি যেন বলছিলেন, মাসুদ ভাই?'

হাসল ও। 'এখনই সব গোমর ফাঁক করতে চাই না। পরে শুনো।'

বৃহস্পতিবার।

গার্সিয়ার টেলিফোন পেয়ে ডিনারের জন্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল নাদিরা। ওকে নিয়ে নাইনথ ও টেনথ অ্যাভিনিউর মাঝামাঝি জায়গার এক বিখ্যাত ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে এল লোকটা। রেস্টুরেন্টের ভেতরের দেয়াল একেবারে সিলিং পর্যন্ত ধবধবে সাদা টাইলে মোড়া। তার ওপর চমৎকার কাঠের প্যানেলিং।

আজ দু'জন বডিগার্ড রয়েছে তার সঙ্গে। শোফার আর আরেকজন সেলসম্যান। ওদের কাছাকাছি বসল লোক দুটো। গার্সিয়ার ভাব চক্কর দেখে মনে হলো, সে-ই বুঝি মালিক এই ইটালিয়ান জয়েন্টের। ম্যানেজার থেকে শুরু করে বয় বেয়ারা প্রত্যেকে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওদের দেখে। ম্যানেজার নিজে দশ মিনিট দাঁড়িয়ে কোনটার স্বাদ কেমন, কোনটা সেনিয়রিটার জন্যে ভাল হবে ইত্যাদি পরামর্শ দিল গার্সিয়াকে।

অর্ডার দেয়ার সময় কোনদিক তাকাল না ইটালিয়ান। বোঝাই যায়, নাদিরা তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছে বলে খুশিতে আটখানা সে। খেতেও পারে মানুষটা রাক্ষসের মত। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে গপাগপ খেলো সে। নাদিরা হাত গুটিয়ে নিয়েছে অনেক আগেই। এমনিতেই রাতে কম খায় ও, তারওপর সবগুলো আইটেমই চর্বিতে ঠাসা। পেটের অর্ধেকটা ভরতেই ক্ষ্যান্ত দিয়েছে সে।

'রোজ রাতে এত খান আপনি?' চোখ কপালে তুলে জানতে চাইল ও।

তৃপ্তির ঢেকুর তুলে ন্যাপকিনে মুখ মুছল গার্সিয়া। হাসল।

'হ্যাঁ।'

'মাই গড!'

খাওয়া শেষে আধ ঘণ্টা মত গল্প করল ওরা বিভিন্ন হালকা প্রসঙ্গ নিয়ে। খাওয়ার ফাঁকে আস্ত এক বোতল ওয়াইন সাবাড় করেছে গার্সিয়া। এবার ব্র্যাণ্ডি নিয়ে পড়ল। রাত ন'টা বাজতে ওঠার আয়োজন করতে লাগল সে। বিল আনতে বলল হেড ওয়েটারকে। হেসে মাথা দোলাল লোকটা। জানাল, বিল নিয়ে ভাবতে হবে না। টাকা দেয়া হয়ে গেছে। 'কার্টসি অভ মিস্টার পিটারসন,' বলল সে।

'পিটারসন কে?' জানতে চাইল নাদিরা।

'আমার এক বন্ধু। ভাল মানুষ। ওয়েল, মাই ডিয়ার,' হাত ঘড়ি দেখল গার্সিয়া। 'রাত কম হলো না, উঠতে হয় এবার। বলো, কোনটা ভাল লাগে তোমার? ডিসকো? পিয়ানো বার? নাকি ক্লান্ত, বিশ্রাম নিতে চাও?'

'এ মুহূর্তে শেষেরটাই পছন্দ আমার। তুমিও কাজের মানুষ, সকালে ঘর ছাড়তে হবে। বেশি রাত করা ঠিক হবে না।'

'একসেলেন্ট,' দুই কানে গিয়ে ঠেকল ইটালিয়ানের হাসি। 'আমার সঙ্গে যদি যেতে বলি তোমাকে, মাইণ্ড করবে?'

খুশি হয়ে উঠল নাদিরা। ওটাই চাইছিল ও। 'কোথায়, তোমার অ্যাপার্টমেন্টে?'

উত্তর দিল না গার্সিয়া, চকচকে চোখে চেয়ে থাকল ওর দিকে।

'না, মাইণ্ড করব না।'

'থ্যাঙ্কস, আয়্যাম অনার্ড।'

টোয়েন্টি ফার্স্ট স্ট্রীটে গ্রামারসি পার্কের কাছে গার্সিয়ার অ্যাপার্টমেন্ট। ভেতরে ঢুকে নাদিরার মনে হলো ঘরে প্রতিটি

জিনিস থেকে যেন প্রাচুর্য ঠিকরে পড়ছে। দুই বেড, দুই বাথ, লাউঞ্জের মত বিশাল লিভিংরুম, দুই বারান্দার বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট। প্রাচুর্যের সঙ্গে রুচিরও সমন্বয় ঘটিয়েছে লোকটা। ভেলভেট মোড়া সোফা-আর্মচেয়ার, ড্রেপার, কার্পেট, সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো পেইন্টিংস, সব চেয়ে চেয়ে দেখার মত।

'তুমি একা থাকো কেন? পরিবারের আর সবাই কোথায়?' জানতে চাইল নাদিরা।

'একা থাকি এই জন্যে যে আমি ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। পরিবারের অন্যরা থাকে ম্যানহাটনে।'

প্রতিটি রুম নাদিরাকে ঘুরিয়ে দেখাল গার্সিয়া। মুগ্ধ হলো ও লোকটার বেডরুম দেখে। চিকচিকে পিংক রঙের দেয়ালের পটভূমিতে হালকা আকাশি পর্দা ও বিছানার চাদর মোহময় করে তুলেছে ঘরের পরিবেশ। ভেতরের বিস্ময় চেপে রাখার কোন চেষ্টা করল না নাদিরা, মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করতে লাগল তার রুচির। সবশেষে কিচেনে নিয়ে আসা হলো ওকে।

এত সুন্দর ঝকঝকে কিচেন আগে কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না নাদিরা। 'বাহ্!'

'আমি নিজ হাতে ধোয়ামোছা, গোছগাছ করি সব,' তৃপ্তির সঙ্গে বলল ইটালিয়ান।

'রান্না?'

'ওটাও আমি করি। ইন ফ্যাক্ট, রান্না আমার সবচে' পছন্দের কাজ। আশা করি একদিন তোমাকে নিজ হাতে রেঁধে খাওয়াবার সুযোগ পাব।'

হাসল নাদিরা। 'আমি সে দিনটির অপেক্ষায় থাকলাম।'

লিভিংরুমে এসে বসল ওরা। বাইরে গার্সিয়ার দুই বডিগার্ড অপেক্ষা করছে। একটু পর সেনিয়রিটাকে তাঁর বাসায় পৌঁছে

দিয়ে আসতে হবে একজনকে, মনিবের হুকুম।

জুতো খুলে বসল নাদিরা। মাখনের মত নরম কার্পেটের স্পর্শ দারুণ লাগছে। 'ড্রিঙ্কস?' বলল গার্সিয়া।

মাথা নাড়ল ও। 'না, ধন্যবাদ।'

নিজের জন্যে ব্র্যাণ্ডি নিয়ে বসল সে। বাচাল হয়ে উঠেছে আবার, একনাগাড়ে বক বক করে চলেছে। এক সময় উঠল লোকটা, আবার ভরে নিয়ে এল গ্লাস। ফের শুরু হলো তার পান আর গল্প। তৃতীয় গ্লাস শেষ হওয়ার পর মনে হলো যেন খানিকটা অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে লোকটা।

'এক্সকিউজ মি,' বলে উঠে গেল সে।

বুঝল নাদিরা, তলপেটের চাপ কমাতে গেছে। কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল, খবর নেই। তারপর আরও কয়েক মিনিট। বিস্মিত হলো ও, করছে কি লোকটা? এত সময় লাগে নাকি? 'রবার্টো!' ডাকল নাদিরা।

উত্তর নেই।

'রবার্টো!' গলা খানিকটা চড়াল এবার ও।

উত্তর নেই।

আসন ছাড়ল নাদিরা। জুতো পায়ে গলাল। তারপর ভয়ে ভয়ে এক পা এক পা করে এগোল মাস্টার বেডরূমের দিকে। দরজার কাছে পৌঁছে উঁকি দিল গলা বাড়িয়ে। কিং সাইজ বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে লোকটা। কাপড় পাল্টাবার সময়ও পায়নি, ঘুমিয়ে পড়েছে। নাক ডাকছে একটু একটু।

কাছে এসে আরও দু'বার তার নাম ধরে ডাকল ও। উত্তর দিল না লোকটা। এবার আস্তে কাঁধ ধরে ধাক্কা দিল সে তার। তথৈবচ। না, ভান নয়, বুঝল নাদিরা, সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। প্রচুর পান করেছে লোকটা আজ।

দ্রুত পায়ে লিভিংরুমে চলে এল নাদিরা। ভেতর থেকে নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল দরজা, বাইরের দুই গার্ড যেন হঠাৎ করে এসে পড়তে না পারে। আবার যখন বেডরুমে ফিরে এল ও, আগের মতই পড়ে থাকতে দেখা গেল গার্সিয়াকে। নড়েনি এক চুল।

এদিক ওদিক তাকাল নাদিরা। ওপাশের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল ওয়াক-ইন ক্লজিটটা পছন্দ হলো প্রথম। খুলল সে ওটা, কিন্তু পনেরো মিনিট পর হতাশ হলো পুরোপুরি, গার্সিয়ার পরিধেয় কাপড়-চোপড়ের বড়সড় এক মজুত ছাড়া কিছুই নেই ওটায়।

অসংখ্য সুট, জ্যাকেট, কোট, হ্যাট, জুতো, টাই। কয়েক কুড়ি দামী শার্ট, মোজা এবং এক রেজিমেন্ট আর্মির জন্যে পর্যাপ্ত স্কার্ফ। দ্বিতীয় ড্রেসারের সবচেয়ে ওপরের ড্রয়ারে ঢিবি দিয়ে রাখা আছে রাজ্যের জুয়েলারি। কাফলিঙ্ক, আংটি, ব্রেসলেট, গলার চেইন, স্টিক পিন, হাতঘড়ি ইত্যাদি। সবগুলোই অত্যন্ত দামী।

নিচের ড্রয়ারে আছে গার্সিয়ার শীতকালীন পোশাক। মোটা ফ্লানেল শার্ট, সোয়েটার, ওয়েস্টকোট, ওভারকোট এইসব। প্রচুর সোয়েড ও দস্তানা–উলের, চামড়ার। দেখা হতে যেটা যেভাবে সাজানো ছিল, ঠিক সেভাবে রেখে ড্রয়ারগুলো বন্ধ করল নাদিরা। মন কিছুটা দমে গেল, যার আশায় এই তৎপরতা তার কোন আভাস পাওয়া যায়নি বলে।

ক্লজিটের সর্বশেষ ড্রয়ার খুলল এবার ও। অসংখ্য পুরু নিটেড সোয়েটার, প্রতিটি আলাদা আলাদা প্লাস্টিক ব্যাগে ভরা। ওগুলো বের করার প্রয়োজন মনে করল না নাদিরা, সাইড দিয়ে হাত গলিয়ে দিল তলার দিকে। হাতে বাধল কিছু। শক্ত, বইয়ের মত। দম বন্ধ হয়ে এল ওর আপনাআপনি, কি ওটা? মুখ ঘুরিয়ে

গার্সিয়ার দিকে তাকাল সে, একই ভঙ্গিতে শুয়ে আছে মানুষটা এদিকে পিছন ফিরে।

আলতো করে জিনিসটা বের করে আনল নাদিরা। একটা পাসপোর্ট। ছবিটা দেখল ও, গার্সিয়ার ছবি। একটা একটা করে পাতা উল্টে চলল ও দ্রুত। বেশ কয়েক দেশে আসা-যাওয়া করেছে লোকটা। হল্যাণ্ড, ইতালি, সুইটজারল্যাণ্ড, ইসরায়েল, দক্ষিণ আফ্রিকা, বেলজিয়াম, জার্মানি, এবং সবশেষে কুয়েত। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও, যা দেখার দেখা হয়ে গেছে।

আবার প্রথম পৃষ্ঠায় ফিরে এল। এবার নতুন একটা ব্যাপার চোখে পড়ল। ছবি আর বিছানার মানুষটা এক হলেও পাসপোর্টে রয়েছে অন্য নাম। আলবার্তো রোসি। সবশেষে গার্সিয়া ওরফে রোসির কুয়েত সফরের সময়টা দেখল নাদিরা আরেকবার। তারপর জায়গামত রেখে দিল বই। উঠে দাঁড়াল ড্রয়ার বন্ধ করে।

খাটের ওপাশে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকল ঘুমন্ত লোকটার মুখের দিকে। চোখেমুখে ফুটে উঠল দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। পিছিয়ে এল নাদিরা। বেডরূমের আলো নিভিয়ে বেরিয়ে এল। সামনের দরজা খুলে ফেলল আস্তে করে। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল দুই গার্ড। সামনের ল্যাণ্ডিঙে দাঁড়িয়েছিল ওরা এতক্ষণ। সেলসম্যান লোকটা উঁকি দিল ঘরের ভেতর। মালিকের দেখা না পেয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল ওর দিকে।

'ঘুমিয়ে পড়েছেন,' বলল সে।

'তাই?' নাদিরার পাশ ঘেঁষে ভেতরে ঢুকে পড়ল লোকটা। হন হন করে এগিয়ে গেল বেডরূমের দিকে। এক মিনিট পরই বেরিয়ে এল সে। নিশ্চিন্ত। ইটালিয়ান ভাষায় শোফারের উদ্দেশে দ্রুত বলল কিছু। মাথা ঝাঁকাল শোফার। 'চলুন, সেনিয়রিটা,'

বলল সে। 'আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

লিফটের দিকে পা চালাল নাদিরা। পিছন পিছন এগোল শোফার। অন্যজন থেকে গেল ঘুমন্ত মনিবের পাহারায়।

ছয়

আরও পাঁচ সকাল কাটাল রানা ইস্ট ফিফটি ফিফথ্ স্ট্রীটে। আরও ভাল করে লক্ষ করল বনোমো ট্রাকের পৌঁছার সময়, রবার্টো গার্সিয়ার গেট খোলা ইত্যাদি।

একদিন পর পর তিন দিন ভাড়া করা গাড়িতে, বাকি দু'দিন উল্টোদিকের রেস্টুরেন্টে বসে। প্রথম দুই দিন আগের রুটিন অনুযায়ীই চলল সবকিছু। নয়টা থেকে নয়টা পাঁচের মধ্যে পৌঁছে যায় বনোমো ট্রাক, ডবল পার্ক করে দাঁড়ায় পেভমেন্ট ঘেঁষে।

হাতে-ঘাড়ে ঘর পরিষ্কারের এটা ওটা সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে আসে দুই ইউনিফর্ম পরা ক্লিনার। পেভমেন্ট পেরিয়ে জায়গামত পৌঁছার আগেই গেট খুলে দেয় গার্সিয়া। কাজটা এমনভাবে করে সে, পরিষ্কার দেখা না গেলেও বোঝা যায়, কারা এল সেদিকে মোটেই নজর দেয় না। ঠিক যেমন বলেছিল রানা, ট্রাক দেখেই নিশ্চিন্ত মনে খুলে দেয় গেট।

ভাব দেখে মনে হয় ওই ট্রাকের অপেক্ষায় ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকে গার্সিয়া। ওটা এসে দাঁড়ালে গেট খোলে, তারপর ক্রু দু'জনকে ভেতরে ঢুকিয়ে আবার বন্ধ করে দেয়। তারপর অন্য কোন কাজে যায়। কিন্তু চতুর্থ দিন স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা গেল।

ট্রাক এসে থামল, ক্রু-রা নেমে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে

থাকল, অধৈর্যের মত পা ঠুকতে লাগল রাস্তায়, কিন্তু গেট খোলে না। দু'তিনবার নকও করল তারা গেটে, তবু দেখা নেই গার্সিয়ার। অবশেষে এল সে, প্রায় এক মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পর। কেন দেরি হলো লোকটার ভেবে পেল না মাসুদ রানা। শেষ দুইদিন আবার যে কে সেই। ট্রাক দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিল সে দরজা।

বোধহয় বাথরূম সারতে গিয়েছিল ব্যাটা সেদিন, ভেবেছে রানা। অথবা পিছনের রূমে ব্যস্ত ছিল। নইলে আর কি হতে পারে? ব্যাপারটা নিতান্তই ক্ষুদ্র, তবু খুঁত খুঁত করতে লাগল মন। রানা ভালই বোঝে, ওই গেট খোলার ওপরই নির্ভর করছে সব।

ওদিকে বনোমো ক্লিনিং সার্ভিসের গ্যারেজ খুঁজে বের করেছে সবুজ। গ্যারেজটা ফিফটি ফোর্থ অ্যাভিনিউর ইলেভেনথ্ স্ট্রীটে। কিন্তু চোদ্দ নম্বর ট্রাকটা স্পট্ করতে লেগেছে ওর তিন দিন। রোজ রাত বারোটায় শিফট বদল হয় ক্লিনারদের, এবং রাত একটায় পথে নামে ওদের গাড়ির বহর। সবুজের অনুমান, পঞ্চাশ থেকে ষাটটা গাড়ি কাজে বের হয়।

ঝাঁকে ঝাঁকে বের হয় ওরা। একই রঙের একই আকারের গাড়ি। চোখ দিয়ে অনুসরণ করা মুশকিল। চোদ্দ নম্বরের সর্বশেষ শিডিউলড্ হল্টেজ রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্স। সারারাত শহরের এখানে ওখানে অফিস-দোকান পরিষ্কার করে ওটা। তারপর ঠিক গ্যারেজে ফিরে যাওয়ার আগে আসে ইস্ট ফিফটি ফিফথ। তার ঠিক আগের হল্টেজ ওটার পার্ক অ্যাভিনিউ।

আরও কয়েকদিন ভ্যানটার পিছনে সবুজকে লেগে থাকার নির্দেশ দিয়েছিল মাসুদ রানা। একই প্যাটার্নে কাজ করে কি না ওটা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে। নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে সে, কোন হেরফের হয় না চোদ্দ নম্বরের প্যাটার্নের।

পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে মাসুদ রানা, পরবর্তী শুক্রবারই চালাবে অপারেশন। তিনদিন পর। তবে সেদিন গার্সিয়ার গেট খুলতে দেরি করার ঘটনাটা মাথায় রেখে পরিকল্পনায় সামান্য পরিবর্তন এনেছে ও। আগে ভেবেছিল নিজেরাই সব করবে। এখন ঠিক করেছে, ছিনতাই করার পর ওদের ড্রাইভারকে দিয়েই চালানো হবে ভ্যান। লোকটার পাশে বনোমোর হেলপারের ইউনিফর্ম পরে বসা থাকবে রানা, তার পাঁজরে ঠেকে থাকবে ওর ওয়ালথার।

অন্যদের হাত-পা বেঁধে পিছনে ফেলে রাখা হবে। জায়গামত পৌঁছে জিনিস-পত্র নিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে সঙ্গে গেটের কাছে পৌঁছাবে রানা। যাতে ওকে দেখে কিছু যদি সন্দেহ করেই বসে গার্সিয়া, পরিচিত ড্রাইভারকে দেখে তা মুহূর্তে দূর হয়ে যায়।

ভ্যান সমস্যার সমাধান হয়ে যেতেই অন্য সমস্যা নিয়ে পড়ল মাসুদ রানা। বনোমোর ইউনিফর্ম সমস্যা। অপারেশনের আরও তিন দিন বাকি। কাজেই এই ক'দিন সকাল-বিকেল দোকানটার ওপর নজর রাখার দায়িত্ব চাপাল রানা ফয়েজ আহমেদের ওপর। রানা যাবে ইউনিফর্ম সমস্যা সমাধান করতে।

ওয়াল স্ট্রীট।

নির্দিষ্ট ভবনের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল মাসুদ রানা। ভবনটা এত উঁচু যে চুড়ো দেখতে গেলে টুপি খসে পড়ে।

এর ছত্রিশ তলার এক প্রতিষ্ঠানে এসেছে রানা। আজব কাজ-কারবার এদের। মূল ব্যবসা আন্তঃরাজ্য মালামাল বহনকারী ট্রাক লুট করা এবং আর কারও লুট বা চুরির মাল নিরাপদে তার পছন্দমত জায়গায় পৌঁছে দেয়া। সে পৃথিবীর যেখানেই হোক। সঙ্গে চোরাই ট্র্যাভেলার্স চেক, এয়ারলাইন টিকেট, স্টক

সার্টিফিকেট, বিয়ারার বণ্ড ইত্যাদি বেচাকেনাও করে। লক্ষ লক্ষ ডলারের ব্যবসা এদের, অথচ অফিস দেখলে কিছুই বোঝার উপায় নেই। এতই সাধারণ যে   চিন্তাই করা যায় না।

প্রতিষ্ঠানের নাম মার্চেন্টস প্রভিশনস, ইনকর্পোরেশন। জেস হ্যামিলটন, প্রেসিডেন্ট। সামনের আউটার অফিসে টাইপ রাইটার নিয়ে বসে আছে ভীষণ মোটা, খাটো, মাঝবয়সী এক মহিলা। ঘন, কুচকুচে কালো চুল মাথায়। ওগুলোকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অদ্ভুত এক চুড়ো খোঁপা বেঁধেছে মহিলা। ফলে বড়সড় একটা গামলার আকার ধারণ করেছে তার মাথা।

দুই কানে ঝুলছে সাইকেলের রিমের চেয়ে সামান্য ছোট সাইজের রিং। আট আঙুলে আট আংটি। পোশাকের বাহারও তেমনি। মহিলা জিপসি। পায়ের শব্দে মাথা তুলে তাকাল সে। 'ইয়েস?' শীতল চোখে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল কয়েকবার।

'আমার নাম উডওয়ার্ড,' বলল রানা। 'মিস্টার হ্যামিলটনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'আমি জানাচ্ছি তাঁকে,' সামনের ছোট টেবিলটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে রীতিমত ধস্তাধস্তি করে উঠে দাঁড়াল জিপসি। ভয় হলো রানার এখনই না মড়াৎ করে ভেঙে পড়ে ওটা। হেলেদুলে একটা বন্ধ দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকে গেল মহিলা। ওপাশ থেকে কেউ হাউমাউ শব্দে কি যেন বলল। ফিরে এল জিপসি।

'যান ভেতরে,' আরেকবার চোখ বোলাল সে রানার ওপর। মাপা, হিসেবী চাউনি।

দরজা ঠেলে ইনার অফিসে ঢুকে পড়ল মাসুদ রানা। সামনে যাকে দেখল, তার বয়স স্বয়ং বিধাতাও জানেন কি না সন্দেহ। সত্তর, আশি, নব্বইও হতে পারে। আবার একশো-দেড়শো

হওয়াও অসম্ভব নয়। যেন জীবন্ত মমি একটা। ঘর ঠাণ্ডা রাখার কোন ব্যবস্থা নেই, ফলে গরম তাওয়ার মত তেতে আছে ভেতরটা।

অথচ মমির পোশাক-আশাক দেখে মনে হচ্ছে যেন নর্থ পোলে আছে। উলের প্লেইড শার্ট পরেছে সে, গলা পর্যন্ত সবগুলো বোতাম আঁটা। তার ওপর কার্ডিগান এবং জ্যাকেট। গলায় পেঁচিয়েছে উলের ইয়া মোটা মাফলার। দু'হাতে একটা ট্যাপ খাওয়া মগ ধরে আছে লোকটা শক্ত করে, ধোঁয়া বেরুচ্ছে ওটা থেকে।

ঝরঝরে একটা কাঠের ডেস্কের ওপাশে এ রুমের একমাত্র চেয়ারটায় বসে আছে লোকটা। ঘরের ফার্নিচার বলতে আছে কেবল এই টেবিল, তার ওপাশের চেয়ার এবং চার দেয়াল। কোন ফাইল কেবিনেট নেই, ভিজিটরদের বসার কোন ব্যবস্থা নেই। দেয়ালে কোন ছবি নেই। টেবিলে একটা খবরের কাগজ পর্যন্ত নেই। দেখেশুনে মনে হয় মাত্র মিনিট পাঁচেক আগে নতুন অফিস খুলেছে লোকটা, আসবাবপত্র পৌঁছার অপেক্ষায় আছে। অথবা ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে সে। সার্ভিস বয়দের জন্যে বসে আছে, ওরা এসে চেয়ার-টেবিলসহ বের করে নিয়ে যাবে তাকে।

'মিস্টার হ্যামিলটন?'

চোখ তুলল মমি। মুখটা যেন তার আফগানিস্তানের রুট ম্যাপ। কপাল, গাল, দুই চোখের নিচে মাকড়সার জালের মত অজস্র সরু সরু স্থায়ী দাগ। পিছনের দেয়াল আর হ্যামিলটনের গায়ের রঙে কোন পার্থক্য নেই, এই প্রথম লক্ষ করল মাসুদ রানা। দুটোই সমান ফ্যাকাসে। মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, ভাল করে না তাকালে ঠাহর করা কঠিন।

নড করল হ্যামিলটন। স্পেশাল নড। প্রথমে ধীরে, তারপর

দ্রুত কয়েকবার ওপর-নিচ করল সে মাথাটা। ভয় হলো রানার সারাদিনে ওই নড থামবে কি না ভেবে। না, মাথার দোল কমে এল আস্তে আস্তে, তারপর থেমে গেল আচমকা।

'ইয়েস?' ফিসফিস করে বলল মমি। রানা শুনল যেন 'স্‌স্‌স্‌!'

'আপনার সঙ্গে কাল টেলিফোনে কথা হয়েছিল আমার।'

'ইয়েস!'

'আমি একটা শিপমেন্ট আশা করছি, আগামীকাল। জিনিসগুলো খুবই মূল্যবান। ওগুলো আমেরিকার বাইরে পাচারের ব্যবস্থা করে দিলে উপকৃত হব। আপনার খরচ ক্যাশে মেটাব আমি।'

তখনই উত্তর দিল না মমি। ফড়াৎ ফড়াৎ করে চায়ে চুমুক দিল কয়েকবার। নিজেকে রানার দুষ্টু ছাত্র মনে হলো, শৃঙ্খলা ভঙ্গ করায় ধরে আনা হয়েছে প্রিন্সিপালের চেম্বারে, দাঁড় করিয়ে রেখে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

'আগে কখনও একসঙ্গে কাজ করেছি আমরা?'

'না,' মাথা দোলাল রানা।

'পরিচয় ছিল আমাদের?'

'না।'

'তাহলে আমার রেফারেন্স কোথায় পেলেন আপনি? কে দিল?'

'আপনার খুব পুরনো এক বন্ধু।'

'নাম?'

'ভিনসেন্ট গগল।'

চুমুক দিতে গিয়েও থেমে গেল মমি। অবাক চোখে তাকাল রানার দিকে। 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। মালটা কি?'

'দামী পাথর। ডায়মণ্ড, রুবি এইসব। সঙ্গে কিছু অলঙ্কার।'

'বড় শিপমেন্ট?'

'তেমন বড় নয়, মোটামুটি।'

'কোথায় যাবে মাল?'

'মিডল ইস্ট।'

আরও কুঁচকে গেল ম্যাপটা। 'মিডল ইস্ট! কোন দেশ?'

'কুয়েত।'

'চার্জ অনেক বেশি পড়বে।'

'পারবেন তো কাজটা করে দিতে? কোন অসুবিধে...'

'চার্জ অনেক বেশি পড়বে,' একঘেঁয়ে সুরে বলল মমি। চুমুক দিল মগে কয়েকবার।

'কত?'

'মালের যা দাম, তার বিশ পার্সেন্ট।'

'পাবেন। কিন্তু মালটা যাতে নির্বিঘ্নে পৌঁছায় জায়গামত, সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা চাই আমার।'

মাথা দোলাল লোকটা। 'এসব কাজে কোন গ্যারান্টি হয় না, মিস্টার,' তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বলল সে, 'কেউ দেবে না আপনাকে গ্যারান্টি।'

'কিন্তু...'

'বাজারে খোঁজ নিয়ে দেখুন, কোন কাজেই গ্যারান্টি দেয় না মার্চেন্টস প্রভিশন্স্। আবার কোন কাজ নিয়ে ব্যর্থও হয় না।'

একটু চিন্তা করে রাজি হয়ে গেল মাসুদ রানা। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। গগলের কাছে শুনেছে ও, এ ধরনের কাজে এর চেয়ে যোগ্য মানুষ আমেরিকায় দ্বিতীয়টি নেই। এর সাহায্য না পাওয়া গেলে ওর একার পক্ষে মালগুলো এ দেশ থেকে বের

করা বড় এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। এরা বনেদি চোর। নীতি মেনে চলে কঠোরভাবে। অন্যের চোরাই মাল হাতে পেলেও আত্মসাৎ করে না কখনও।

'ঠিক আছে। আমি রাজি।'

'মাল হাতে আসামাত্র ফোন করবেন।'

'নিশ্চই। নাইস টু মিট ইউ।'

বেরিয়ে এল রানা ঘর ছেড়ে। ট্যাক্সি চেপে হোটেলে ফেরার পথে জেস হ্যামিলটনের কথা ভাবল। রেফারেন্স না থাকলে কারও কাজ হাতে নেয় না লোকটা। যারটা নেয়, শেষ না করে ছাড়ে না। লোকটার অফিস নিয়ে ভাবল ও। এক নম্বরি আর দুই নম্বরি, যা-ই হোক, ব্যাটার অফিসটা কেমন যেন। কোন ফাইলপত্র নেই, কিচ্ছু নেই। অন্তত লোক দেখানো কিছু তো থাকবে। তা-ও নেই।

অবশ্য যে ধরনের কাজ তার, তাতে…তাছাড়া গগল যখন দিয়েছে নামটা, তার চিন্তার কিছুই নেই। এই জগৎটাকে অনেক অনেক ভাল চেনে গগল। দুপুরের খাওয়া সেরে একবারে হোটেলে ফিরল মাসুদ রানা। কাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠল। এবং গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল দুই মিনিটের মধ্যে। অ্যাকশনে নামার আগে যতটা সম্ভব ঘুমিয়ে নেয়া ভাল। পরে আর কখন বিশ্রাম নেয়ার সময় জুটবে কে জানে।

ওদিকে সারা দুপুর ম্যানহাটনে টো-টো করে ঘুরে বেড়াল ফয়েজ পছন্দসই একটা জায়গার খোঁজে। যেখানে অপারেশন সেরে জড়ো হবে ওরা, মালপত্র জেস হ্যামিলটনের হাতে তুলে দেয়ার জন্যে প্যাকেট করবে। অবশেষে ফর্টি সেভেনথ স্ট্রীটের নাইনথ অ্যাভিনিউতে পছন্দসই একটা জায়গা পাওয়া গেল।

একসার পরিত্যক্ত দোকানঘর, ওয়্যারহাউস ইত্যাদির মাঝে

একটা প্যাডলক গ্যারেজ। পুরো ব্লকটা জনহীন। পরিত্যক্ত। প্রত্যেকটা ঘরের জানালা-দরজা মেটাল শীট দিয়ে ঢেকে পেরেক ঠুকে বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। খুব শিগ্‌গিরই ভেঙে ফেলা হবে এসব পরিত্যক্ত সম্পত্তি, তার জায়গায় উঠবে নতুন হাই রাইজ হাউজিং কমপ্লেক্স। এলাকাটা ঘিরে অসংখ্য 'নো ট্রেস্‌পাসিং' বোর্ড টাঙানো রয়েছে।

গ্যারেজটা ব্লকের মাঝামাঝি জায়গায়। বড় দুই পাল্লার দরজা। গাড়ি রেখে নেমে এল ফয়েজ আহমেদ। গেটের তালা পরখ করল—ফাইভ অ্যাণ্ড টেন প্যাডলক। ওই তালা খোলা এক মিনিটেরও কাজ নয়। গ্যারেজের চারদিকে একটা চক্কর দিয়ে এল সে। পছন্দ হয়ে গেল। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে কাজ সেরে বেরোবার দশ থেকে পনেরো মিনিটের ভেতর পৌঁছে যেতে পারবে ওরা।

এবার খুঁজেপেতে একটা সরু স্টীলের তার বের করল ফয়েজ। ওটার একমাথা তালায় ঢুকিয়ে সামান্য খোঁচাখুঁচি করতেই খুলে গেল পুরনো প্যাডলক। ভেতরটা প্রায় টেনিস কোর্টের মত বড়। খুশি হয়ে উঠল সে। জায়গাটা যেমন দারুণ, তেমনি গ্যারেজ।

শেষ বিকেলে জায়গাটা রানাকে দেখাতে নিয়ে এল ফয়েজ। দূর থেকে গ্যারেজটা দেখল রানা প্রথমে, তারপর গাড়ি নিয়ে পুরো ব্লকটা চক্কর দিয়ে এল একবার ধীরগতিতে। থামল এসে গ্যারেজের সামনে।

নেমে পড়ল মাসুদ রানা। ওটার ভেতর-বার দেখল ভাল করে। তারপর বলল, 'মনে হয় ভালই চলবে কাজ। লোকেশনটা চমৎকার।'

সকাল সাড়ে সাতটা।

গাড়ি চালাচ্ছে মাসুদ রানা। পাশে নাদিরা। পিছনে মুত্তাকিম বিল্লাহ ও ফয়েজ আহমেদ। গাড়িটা ভাড়া করা একটা ফোর্ড।

মাঝখানে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চোদ্দ নম্বর বনোমো ক্লিনিং ভ্যানকে অনুসরণ করছে ওরা। কথা নেই কারও মুখে। সামনে তাকিয়ে বসে আছে রানা মূর্তির মত। উইণ্ডশীল্ডে নিজের আবছা অবয়ব দেখতে পাচ্ছে ও, স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ চওড়া ওটা। ভিউ মিররে তাকাল রানা এক পলক। চোখ পড়ল দানবের ওপর। ধ্যানমগ্নের মত বসে আছে সে, নজর শিকারী বাজের মত স্থির।

'আর দুটো হল্টেজ,' বলল নাদিরা। 'তাই না?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রানা।

আরও পাঁচ মিনিট চলার পর পিছনের ব্রেক লাইট জ্বলে উঠল ভ্যানের। থেমে দাঁড়াতে যাচ্ছে। চট্ করে গতি কমাল রানা। দাঁড়িয়ে পড়ল একটা পার্কিং সাইনের নিচে। ফিফটিয়েথ ও মেডিসনের মাঝামাঝি একটা কম্বলের দোকানের সামনে ডবল পার্ক করল বনোমো ভ্যান।

ড্রাইভার এবং পাশে বসা তার হেলপার নেমে এল রাস্তায়। ঘুরে ভ্যানের পিছনে চলে এল ওরা, পিছনের পাল্লা খুলে বাঁদরের মত লাফিয়ে ক্যারিয়ারে উঠে পড়ল হেলপার। সরঞ্জাম নিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল। পাল্লা বন্ধ করে পেভমেন্টে উঠল তারা, ঢুকে পড়ল নির্দিষ্ট দোকানে। ঠিক আধঘণ্টা পর আবার দেখা দিল লোক দুটো, ব্যস্ত পায়ে গাড়িতে ফিরে এল, পরমুহূর্তে রওয়ানা হয়ে গেল ভ্যান।

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। আটটা দশ। টাইম শিডিউল খুব কঠোরভাবে মেনে চলে ব্যাটারা। ওদের এবারের গন্তব্য একটা

অ্যান্টিক স্টোর, রবার্টো গার্সিয়ার আগের শেষ হল্টেজ। ভ্যানের পিছন পিছন ফিফটি থার্ড এবং ফিফটি ফিফথের মাঝামাঝি পর্যন্ত এল ওরা, তারপর আবার পার্ক করল রানা। সামনে ভ্যানটাও দাঁড়িয়ে পড়েছে অ্যান্টিক স্টোরের সামনে।

আরেকবার ঘড়ির ওপর চোখ বোলাল রানা–সোয়া আট। পেভমেন্টে পিল্ পিল্ করছে মানুষ। অফিসে চলেছে নানান বয়সী মেয়ে-পুরুষ। যারা দূরে যাবে, বাস স্টপেজে সুশৃঙ্খলভাবে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। অন্যরা প্রায় ছোটার গতিতে হাঁটছে। কোনদিকে তাকাবার সময় নেই কারও।

আকাশে মাথা ঠেকিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা ভবনগুলোর মাঝের অসংখ্য সরু ফাঁক গলে তির্যকভাবে রাস্তায় এসে পড়েছে সকালের ফালি ফালি মিষ্টি রোদ। ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা। ভেজা রাস্তা চকচক করছে রোদ মেখে। দিনটা আজ ভালই কাটবে মনে হচ্ছে, আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবল মাসুদ রানা। মেঘ নেই কোথাও এক বিন্দুও, চকচক করছে ফিকে নীল আকাশ। ততক্ষণে অ্যান্টিক স্টোরের ভেতরে ঢুকে পড়েছে দুই ক্লিনিং ক্রু।

'চল্লিশ মিনিট মত থাকবে ওরা এখানে,' বলল রানা। 'এরপর কোথায় যাবে জানা আছে আমাদের। কাজেই এখানে বসে না থেকে জায়গামত গিয়ে অপেক্ষা করি, কি বলো?'

'কিন্তু... ।' থেমে গেল ফয়েজ বক্তব্য শেষ না করে।

'কি?' বলল রানা।

'এই দুই স্টপেজের মধ্যেই কোথাও ভ্যানটার দখল নিতে হবে আমাদের, মাসুদ ভাই। কাজটা কোথায় সারা যায় এই বেলা চেক করে রাখা গেলে ভাল হত না?'

মুচকি হাসি ফুটল রানার মুখে। গীয়ার দিল ও। 'ভেব না,

ঠিক করে ফেলেছি সে জায়গা।'

'তাই নাকি?' বলল বিল্লাহ।

মাথা দোলাল রানা। গাড়ি ছাড়ল। 'হ্যাঁ। কেউ খেয়াল করেছ, ওরা যখন গাড়ি পার্ক করে রেখে কাজে যায়, সাজ-সরঞ্জাম বের করার পর পিছনের দরজা যে লক্ করে না? আমি করেছি। যত জায়গায় থামে, কেবল ইগনিশন চাবি পকেটে নিয়েই নেমে আসে ড্রাইভার। পিছনের পাল্লা দুটো খোলাই থাকে। ভিড়িয়ে রেখে যায় কেবল।'

'আরে! তাই নাকি? দেখিনি তো!' বিস্ময় প্রকাশ করল ফয়েজ।

বিল্লাহ বলল, 'আমিও না।'

'ওই সুযোগটাই কাজে লাগাব আমরা। অপারেশনের দিন ওরা যখন অ্যান্টিক শপে ঢুকবে...'

রানাকে কথা শেষ করতে দিল না বিল্লাহ, 'আমাদের অন্য সঙ্গীরা তখন ভ্যানে উঠে বসে থাকবে।'

'তাদের পরনে থাকবে বনোমো কভারলস্,' যোগ করল ফয়েজ উচ্ছ্বসিত গলায়। 'বাহ্! যার খুশি দেখুক, বুঝতেই পারবে না কিছু।'

'ঠিক,' বলল রানা। 'ওরা যখন কাজ সেরে বেরিয়ে এসে ভ্যানের পিছন দরজা খুলবে...'

আবারও বাধা দিল বিল্লাহ, 'দেখবে, ওদের দিকে তাকিয়ে আছে ব্রুকলিন-ম্যানহাটন টানেলের মত লম্বা পিস্তলের মাজল।'

পাশে তাকাল মাসুদ রানা। ওর দিকে চেয়ে আছে নাদিরা জিজ্ঞাসু চোখে। ব্যাপারটা ইংরেজিতে বুঝিয়ে বলল তাকে রানা। হেসে মাথা দোলাল মেয়েটি। 'ফ্যানটাস্টিক!'

ঠিক নয়টা তিন মিনিটে রবার্টো গার্সিয়ার সামনে ডবল পার্ক

করল বনোমো ভ্যান। পিছন থেকে ক্যানিস্টার ভ্যাকিউম ক্লিনার, প্লাস্টিকের বালতি, কাপড়ের ডাস্টার, পালকের ডাস্টার ইত্যাদি বের করে পেভমেন্টে উঠে এল হেলপার। তার পিছনে ভ্যানের দুই পাল্লা ঠেলে ভিড়িয়ে রাখল ড্রাইভার। তারপর দু'জনে মিলে পা বাড়াল রবার্টো গার্সিয়ার দিকে। গেটের ব্যাপারটা সবাই লক্ষ করেছে এবার।

পিছনে ফয়েজ হেসে হেসে কী যেন বলল বিল্লাহকে। সে-ও হেসে উঠল। কিন্তু সেদিকে মন নেই মাসুদ রানার। হঠাৎ করেই ঘামতে শুরু করেছে ও। মনের মাঝে বারবার উঁকি দিচ্ছে অশুভ চিন্তা। রানা ভালই বোঝে, ঠিক কি করতে যাচ্ছে ও। দিনের পরিষ্কার আলোয় স্রেফ ডাকাতি করতে যাচ্ছে ও আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যস্ততম শহরের বুকের ওপর।

কাজটা নির্বিঘ্নে সারতে পারবে তো ও? নাকি জড়িয়ে পড়বে কোন কঠিন ঝামেলায়? রবার্টো গার্সিয়াকে আণ্ডার এস্টিমেট করছে না তো রানা? মাফিয়ার লেজে পা দিয়ে নিজের মরণ ডেকে আনছে না তো?

সাত

বড়দিন এসে পড়েছে। তাকে বরণ করার তোড়জোড় চলছে। যেদিকেই চোখ যায়, ধপধপে সাদা নকল দাড়িওয়ালা সান্তা ক্লজ চোখে পড়ে কেবল। রাস্তায় রাস্তায়, মোড়ে মোড়ে সান্তা ক্লজ আর সান্তা ক্লজ। হাতে তাদের সারাক্ষণ ঘণ্টা বাজছে। চোখে বিস্ময় নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে শিশুরা। বিস্ময়ের সঙ্গে কিছু না কিছু পাওয়ার আশাও ফুটে থাকে ওদের চাউনিতে।

প্যাচপ্যাচে বৃষ্টিভেজা দিন। আকাশ মেঘলা থাকে সারাক্ষণ। প্রচণ্ড শীত। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না শহরবাসীর। এসবে তারা অভ্যস্ত। কোলেরটা-কাঁখেরটা নিয়ে মহানন্দে কেনাকাটা করে বেড়াচ্ছে সবাই। এক হাতে তাদের কড়কড়ে নোট, অন্য হাতে ব্লুমিংডেলের শপিং ব্যাগ। চোখে-মুখে টাকা খরচ করার উন্মাদনা।

সব দোকানেই ঢোকা চাই তাদের, যেন তা না হলে মাটি হয়ে যাবে বড়দিনের আনন্দ। কিছু না কিছু কিনতেই হবে প্রতিটা থেকে, যার বেশিরভাগই রংচঙে কাগজ আর লাল ফিতে দিয়ে প্যাকেট করা থাকে। ওপরে লেখা থাকে, ডু নট ওপেন আনটিল ক্রিসমাস। সকাল আটটা থেকে আরম্ভ হয় তাদের দোকানের পর দোকান চষা, চলে মাঝরাত পর্যন্ত।

ওদের জন্যে বাড়তি সুবিধে হয়ে দেখা দিয়েছে সময়টা। এমন সার্বক্ষণিক হাটের মধ্যে কে খেয়াল করবে কোন এক ক্লিনিং এজেন্সির ইউনিফর্ম পরা একদল ক্রুকে, কে দেখতে যাবে কোত্থেকে কি করে এসেছে তারা?

ভোর ছ'টায় ঘুম ভেঙেছে মাসুদ রানার। শাওয়ার শেভ সেরে বাইরে থেকে নাস্তা করে হোটেলে ফিরে এসেছে ও আবার। জানালায় দাঁড়িয়ে নিচের জনস্রোত দেখতে দেখতে নতুন করে প্ল্যানটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। বিছানায় মাথার কাছে টিভি চলছে। এখানে ওঠার পরদিন বাড়তি পয়সা দিয়ে টিভিটা আনিয়ে নিয়েছে ও কঙ্কালের কাছ থেকে। পরে জেনেছে রানা, ওই লোকই মালিক হার্ড-অনের।

হঠাৎ কি একটা কানে যেতে সচকিত হলো মাসুদ রানা। খবর হচ্ছে টিভিতে। কি যেন বলছে পাঠক, শব্দগুলো অস্বাভাবিক ঠেকেছে। ঘুরে দাঁড়াল ও। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকল

পর্দার দিকে। সান ফ্রান্সিসকোর বড় এক জুয়েলারি শপে ডাকাতি হয়েছে গতকাল, সেই খবর পড়ছে পাঠক।

তাড়াতাড়ি বিছানায় এসে বসল ও, একটা শব্দও যেন মিস না হয়। ওখানকার অন্যতম বৃহৎ জুয়েলারি শপ, ডিভোল্ট ব্রাদার্সে ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে কাল দুপুরে, লাঞ্চ আওয়ারে। দলে পাঁচ অথবা ছয়জন মুখোশ পরা গানম্যান ছিল। কর্মচারীদের জিম্মি করে দামী দামী সব জিনিস নিয়ে গেছে তারা। এতই দ্রুত এবং আচমকা ঘটেছে ব্যাপারটা যে অ্যালার্ম বাজানোর সময় পায়নি কেউ। পুলিসও টের পায়নি কিছু। আধঘণ্টা ধরে নিশ্চিন্তমনে কাজ সেরেছে ডাকাতরা। প্রায় চার মিলিয়ন ডলারের সম্পদ হারিয়েছে ডিভোল্ট ব্রাদার্স।

পুরো খবর শুনে তাজ্জব হয়ে গেল মাসুদ রানা। বসে থাকল বজ্রাহতের মত। শুধু সময়ের ব্যাপারটা ছাড়া প্ল্যানের আর সব হুবহু যেন ওরই করা রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্স ডাকাতির প্র্যাকটিকাল রিহার্সেল ছিল। কেউ ধরা পড়েনি, আহতও হয়নি। ভেতরে ঢুকেছে এবং টপাটপ মাল হাতিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে নির্বিঘ্নে।

খুশি হওয়ার মত ব্যাপার হলেও উল্টে ভাবনায় পড়ে গেল রানা। এই ঘটনায় সতর্ক হয়ে যেতে পারে গার্সিয়া, ওদের সহজ কাজটা জটিল হয়ে উঠতে পারে। হারামজাদারা কাজটা করার আর সময় পেল না? চোখের সামনে কাল্পনিক সব ব্যানার হেডিং নেচে বেড়াতে লাগল রানারগু ডাকাতির অভিযোগে মাসুদ রানাকে খুঁজছে পুলিস, বা এফবিআই মাসুদ রানার সন্ধান চায় অথবা রানা এজেন্সির চীফ নিরুদ্দেশ।

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল মাসুদ রানা। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আবার রূমে ফিরে এল একগাদা খবরের কাগজ বগলদাবা

করে। খবরটা বিস্তারিত পড়তে হবে। সবগুলো পত্রিকাতেই খবরটা ছাপা হয়েছে, এবং সবগুলোই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল রানা।

ছয়জন অস্ত্রধারী লাঞ্চের সময় আচমকা ঢুকে পড়ে ডিভোল্ট ব্রাদার্সে। তাদের দু'জন দোকানের কর্মচারী এবং উপস্থিত ক্রেতাদের গুলি করার হুমকি দিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়তে বাধ্য করে। এই ফাঁকে অন্য চারজন ডিসপ্লে শোকেস ও পিছনের ভল্টরূমে লুটপাট চালায়। পরে সমস্ত মালামাল বালিশের কভারে ভরে দ্রুত চম্পট দেয় ডাকাতদল।

বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাদের দলনেতা দোকানের ফ্রন্ট ডোরের নিচে একটা রাবারের গোঁজ ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। ফলে পুলিস এসে উদ্ধার না করা পর্যন্ত ভেতরের কারও পক্ষে বের হওয়া সম্ভব হয়নি। এই ফাঁকে দুটো গাড়িতে করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় ডাকাতদল।

আবার দুশ্চিন্তাটা পেয়ে বসল মাসুদ রানাকে। গার্সিয়াও নিশ্চয়ই এতক্ষণে জেনে গেছে এ খবর। কি প্রতিক্রিয়া হবে লোকটার মধ্যে? নিজের দোকানের নিরাপত্তার ব্যাপারে নতুন কোন পদক্ষেপ নেবে সে? নিলে কি হতে পারে সেটা? মেজাজ তেতো হয়ে গেল। না চাইলেও প্ল্যান কার্যকর করার দিন অন্তত কয়েক দিন পিছিয়ে দিতে হবে ওকে। গার্সিয়ার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ওপথে পা বাড়ানো হবে চরম গাধামি।

ওইদিনই সকালে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে টেলিফোনের আওয়াজে ঘুম ভাঙল নাদিরার। কয়েকদিন হলো হোটেল ছেড়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে থাকার অনুমতি দিয়েছে ওকে মাসুদ রানা। ব্যস্ত না হয়ে আড়মোড়া ভাঙল ও, হাই তুলল, তারপর কানে লাগাল

রিসিভার। 'ইয়েস?'

'গার্সিয়া বলছি।'

তড়াক করে উঠে বসল সে। ঘুমের রেশ পর্যন্ত গায়েব হয়ে গেছে। 'গার্সিয়া?'

'কাল সকাল সাড়ে আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত ছিলে কোথায়? ফোন করতে করতে আঙুল খসে পড়ার অবস্থা হয়েছিল আমার।'

'ওহ্হো, খুব দুঃখিত। জরুরী একটা কাজে ভোরেই বেরিয়ে যেতে হয়েছিল।' অম্লান বদনে বলল নাদিরা। কাল ওই সময় বনোমো ভ্যানের পিছু লেগেছিল ওরা। 'তারপর? ব্যবসা কেমন চলছে?'

'ভাল।'

'শুনে খুশি হলাম। তারপর বলো, কেন ফোন করেছ?'

'আজ সন্ধেয় ফ্রী আছ তুমি?'

'কেন?'

'ভেবেছিলাম আজ রাতে একসঙ্গে ডিনার করব আমরা।'

হাসল নাদিরা। 'তোমার বাসায় নিশ্চই?'

'এগজ্যাক্টলি!'

'আই উড বি ডিলাইটেড।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। সাতটায় তোমাকে নিতে আসব আমি।'

'উঁমম! ঠিক আছে। আমি তৈরি থাকব।'

'ধন্যবাদ।'

'গুড,' নাদিরার মুখে গার্সিয়ার নিমন্ত্রণ করার কথা শুনে খুশি হয়ে উঠল মাসুদ রানা। ফিফটি সেকেণ্ড অ্যাভিনিউর এক রেস্তোরাঁয় মিলিত হয়েছে ওরা। একান্ত প্রয়োজন না হলে এখন আর এজেন্সি অফিসে যায় না রানা। যদি যেতে হয়, গভীর রাতে খুব

গোপনে যায়। অন্য সময় হার্ড- অনেই থাকে ও। 'ভেরি গুড। অনেক উপকার হবে আমাদের।' মেয়েটিকে ভাল করে শিখিয়ে দিল রানা কিভাবে প্রসঙ্গটা তুলতে হবে। কোন কোন তথ্য জানার চেষ্টা করতে হবে। অবশ্য কোন প্রশ্নের উত্তর যদি সে দিতে আপত্তি করে বা এড়িয়ে যেতে চায়, সেক্ষেত্রে একই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার করা ঠিক হবে না বলে সতর্ক করে দিল ও।

'ক্যাজুয়াল প্রশ্ন করবে। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে এখন একটা তখন আরেকটা এইভাবে। সতর্ক থাকবে। চেহারায় যেন খুব একটা আগ্রহের ভাব দেখা না যায় তোমার। কোন কিছু সন্দেহ করে বসার সুযোগ যেন না পায় গার্সিয়া।'

'ঠিক আছে। সতর্ক থাকব আমি। আমাদের প্রোগ্রাম পিছিয়ে দেয়া হলো ডিভোল্ট ব্রাদার্সের কারণে?'

'অবশ্যই! লোকটা কিভাবে রিঅ্যাক্ট করে না জেনে এই অবস্থায় কিছু করতে যাওয়া হবে স্রেফ বোকামি। তাড়াহুড়ো করতে গেলে সব ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। এই পর্যায়ে তিল পরিমাণ ঝুঁকিও নেয়া চলবে না। তাতে যদি আরও এক সপ্তাও অপেক্ষা করতে হয় আমাদের, তাও ভাল।'

'ঠিক,' সায় দিল মুত্তাকিম। 'এত কষ্টের প্ল্যান কোনমতেই বরবাদ হতে দেয়া যায় না।'

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল নাদিরা। আজ আর কোন কাজ নেই তার সন্ধের আগে। কাজেই শুয়ে বসে ঘুমিয়ে দিনটা পার করে দিল সে। অপেক্ষার সময় কাটে না। অপেক্ষা করতে করতে বিরক্তি ধরে গেল। অতপর এক সময় শেষ হলো প্রতীক্ষার পালা। আঁধার ঘনিয়ে এল।

ছ'টার দিকে তৈরি হয়ে নেয়ার জন্যে উঠল ও। এই সময় ফোনটা বেজে উঠল। 'ইয়েস!' সাড়া দিল ও তৎক্ষণাৎ, ভেবেছিল

মাসুদ রানা বুঝি। নতুন কোন পরামর্শ দেবে।

'গার্সিয়া।'

'কোত্থেকে?'

'দোকান থেকে।'

'এত জলদি? সবে তো ছ'টা। এখনও তৈরি হইনি আমি।'

'শোনো, নাদিরা। ফোন করেছি আমি অন্য ব্যাপারে।'

'অন্য ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ, আমি খুবই দুঃখিত। এদিকে একটা ঝামেলা... আজকের ডিনারের প্রোগ্রাম বাতিল করা ছাড়া কোন উপায় নেই আমার। খুব লজ্জিত আমি। কিছু মনে কোরো না, প্লীজ। ক্ষমা চাইছি আমি।'

'না, না, এতে মনে করার কি আছে? কিন্তু হঠাৎ এমন কি ঝামেলা দেখা দিল?'

'দোকানের স্টক চেক করতে হচ্ছে খুব শর্ট নোটিশে। যে কারণে আটকে গেছি।'

'অল রাইট। কোন অসুবিধে নেই। আগে কাজ, তারপর আর সব। পরে আর কোনদিন...'

'না না, পরে নয়। কালই ডিনার করব আমরা।'

'কাল?'

'হ্যাঁ। কাল সন্ধে ঠিক সাতটায় আসছি আমি।'

'অল রাইট।'

'তুমি মাইণ্ড করলে না তো?'

মৃদু হাসি দিল নাদিরা। 'প্রশ্নই আসে না।'

'দ্যাট'স মাই গার্ল। থ্যাঙ্ক ইউ। রাখলাম।'

রিসিভার রেখে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে এসে বসল নাদিরা। একটা ভুরু তুলে বলল, 'মাই গার্ল! ব্যাটা বামন, চাঁদ

ধরার সখ চেপেছে!' অলস ভঙ্গিতে চুলে ব্রাশ বোলাতে আরম্ভ করল ও। কেন যেন হঠাৎ করেই মাসুদ রানার মুখটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। সঙ্গী হিসেবে ঠিক ওর মত ছেলেদেরই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে মেয়েরা।

বেশ কয়েকদিন ধরে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে ওরা। মানুষটাকে যতই দেখে, যতই তার তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় পায়, ততই অবাক হয় নাদিরা। কেউ আন্দাজও করতে পারবে না, ভেতরে ভেতরে মাসুদ রানার মন পাওয়ার জন্যে সে কতটা ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। লোকটা যদি হাত পাতে, নিজেকে উজাড় করে দেবে সে। হাত থেমে গেল। পূর্ণ চোখ মেলে আয়নায় নিজেকে দেখল। মাসুদ রানার পাগল করা হাসি মাখা মুখটা দেখতে পেল নাদিরা নিজের মুখের পাশে।

'দ্যাট'স মাই ম্যান,' আবেশ জড়ানো কণ্ঠে বলল ও। 'দ্যাট'স মাই লাভ।'

উঠল নাদিরা। মাসুদ রানার উদ্দেশে জিভ ভ্যাংচাল। তারপর ওইদিনের নিউ ইয়র্ক পোস্ট নিয়ে উঠে পড়ল বিছানায়। সান ফ্রান্সিসকোর ডাকাতির ঘটনাটা পড়ল আবার নতুন করে। ঠিক যেন রানার প্ল্যানের ট্রু কপি।

মাথার নিচে দু'হাত রেখে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল সে। আকাশ-পাতাল ভাবনা স্থান করে নিল মাথার ভেতর। হঠাৎ উঠে বসল নাদিরা। ফোন করে রানাকে গার্সিয়ার প্রোগ্রাম বাতিলের কথা জানাতে হবে।

'চমৎকার!' নাদিরার দিকে তাকিয়ে হাসল রবার্টো গার্সিয়া। 'দারুণ লাগছে আজ তোমাকে।'

'ধন্যবাদ।'

হাত বাড়াল ইটালিয়ান। ‘এসো। দেরি করে লাভ নেই। রওনা হওয়া যাক।’

নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার লেটেস্ট মডেলের ঝকঝকে ক্যাডিলাক। শোফার-কাম-বডিগার্ড দরজা মেলে ধরল, উঠে পড়ল দু’জনে। পথে সারাক্ষণ বক্‌বক্ করে গেল গার্সিয়া, যার বেশিরভাগই কানে যায়নি নাদিরার। বিশ মিনিটের পথ পেরিয়ে গার্সিয়ার বিলাসবহুল মিউজিয়াম অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছল ওরা।

ঘরটা মোটামুটি ভালই সাজিয়েছে আজ গার্সিয়া। রুমগুলো প্রায় ভরে ফেলা হয়েছে ফুলে ফুলে। ঘরের মালিক নিজেও সাজগোজ কম করেনি। গ্রে ফ্লানেল প্যাকস আর হাউণ্ড’স-টুথ জ্যাকেট পরেছে সে, পায়ে চ্যাপ্টা কালো মোকাসিন। মন্দ লাগছে না দেখতে।

‘চলো, কিচেনে যাই একবারে,’ নাদিরাকে তার মিঙ্ক খুলতে সাহায্য করল গার্সিয়া। ‘আমি রাঁধব, তুমি বসে বসে দেখবে, ওকে?’

‘ওকে, স্যার। না, সেনিয়র,’ হাসল ও মিষ্টি করে।

লোকটার পিছন পিছন তার কিচেনে এসে ঢুকল। বসে পড়ল একটা উঁচু টুলে। ‘কি খাবে, বলো, কোল্ড অর হট?’ বলল গার্সিয়া।

‘হট।’

ওপাশের সাইড বোর্ডের ওপর রাখা কফি ডিসপেনসার দেখাল সে হাত তুলে। ‘হেলপ ইওরসেলফ, প্লীজ!’

বসে বসে লোকটার রান্না দেখতে লাগল নাদিরা, ফাঁকে ফাঁকে চুমুক দিচ্ছে ধূমায়িত কফিতে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বুঝে ফেলল ও, সত্যিই রাঁধতে জানে গার্সিয়া। ওস্তাদ রাঁধুনি। এবং এ কাজে নিজের ওপর পুরোপুরি আস্থা আছে তার।

গ্লাসে খানিকটা মার্টিনি ঢেলে নিয়েছে সে। থেকে থেকে চুমুক দিচ্ছে তাতে, এটা কুটছে ওটা ধুচ্ছে, অমুকটা নাড়ছে, তমুকটার স্বাদ চেখে দেখছে, মোট কথা সারাক্ষণ ভন্ ভন্ করছে মাছির মত। কখনও চোখ তুলে নাদিরাকে দেখছে, হাসছে ঠোঁট টিপে।

'স্টক চেক করা হয়েছে?' তরল কণ্ঠে প্রশ্ন করল নাদিরা।

'কি?'

'তোমার দোকানের স্টক চেকিং শেষ হয়েছে?'

'ও, হ্যাঁ। হয়ে গেছে। ঠিকই আছে সব, কোন গোলমাল ধরা পড়েনি,' এদিকে না তাকিয়ে বলল লোকটা।

'এটা কি রুটিন চেকিং? বছরে কয়বার স্টক চেক করতে হয় তোমাকে দোকানের?'

'মাসে একবার করে।'

'চুরি-টুরি হয় কি না যাচাই করার জন্যে?'

দ্রুত মাথা দোলাল সে, 'চুরি রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সে হয় না কখনও। ওই খাতে বছরে এক পয়সাও লস হয় না আমার।'

'চুরি হয় না?' বিস্মিত হওয়ার ভান করল নাদিরা, 'বলো কি! ঠেকাও কি করে?'

মুচকে হাসল গার্সিয়া। 'তুমি হয়তো লক্ষ করোনি, ক্রেতাদের একসঙ্গে একটার বেশি আইটেম দেখাই না আমরা। একবারে একটা। দেখা শেষ হলে প্রথমটা তুলে রেখে তবে আরেকটা বের করা হয়।'

'তাহলে চেক করার কি প্রয়োজন পড়ল?'

'প্রয়োজনটা ইন্টারনাল।'

তার মানে কর্মচারীরা বিশ্বস্ত নয়?'

হাসল গার্সিয়া। কেমন যেন কঠিন লাগল হাসিটা। 'ওরা প্রত্যেকে খুবই বিশ্বস্ত। তারপরও...বুঝলে না! অনেক ছোট ছোট

দামী পাথরের কারবার। মাঝে মাঝে চেক করা ভাল।'

ঠিকই বলেছে লোকটা, ভাবল সে। কিন্তু মনের ভেতর কেমন যেন খটকা লাগছে। মনে হচ্ছে ওর হাসির আড়ালে কিছু একটা ছিল। অনেকটা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ধরনের। তাই কি? না ভুল বুঝছে ও?

রাজকীয় ডিনার খেয়ে মনে মনে গার্সিয়ার প্রশংসা করল নাদিরা পঞ্চমুখে। সত্যিই রাঁধতে জানে ইটালিয়ান। কফি নিয়ে লিভিংরূমে এসে বসল দু'জনে। 'অনেক কষ্ট করেছ তুমি,' বলল নাদিরা। 'এবার যদি বাসন-কোসন ধোয়ার কাজে কিছু সাহায্য না করি তোমাকে, অন্যায় হয়ে যাবে।'

'ননসেন্স। ও জন্যে লোক আছে। কেমন রেঁধেছি, বলো।'

'এত চমৎকার রান্না বহুদিন খাইনি আমি।'

'ও, রিয়েলি?' খুশিতে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল গার্সিয়ার।

'ইয়েস, সেনিয়র।'

'থ্যাঙ্কস।' কথার ফাঁকে ফাঁকে আধ বোতল মার্টিনি শেষ করে ফেলল মানুষটা দেখতে দেখতে। ফলটাও ফলল তেমনি দ্রুত। কথা জড়িয়ে আসতে শুরু করল তার। ঢুলু ঢুলু করছে চোখ।

'সেই ডাকাতির খবর শুনেছ?' হঠাৎ প্রসঙ্গটা তুলল নাদিরা। 'সান ফ্রান্সিসকোর সেই জুয়েল রবারির ঘটনা? দু দিন আগে...'

'একদিন আগে। ডিভোল্ট ব্রাদার্স...হ্যাঁ, শুনেছি। কাগজেও পড়েছি।' ওঠার জন্যে নিজের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করল সে।

'কি হলো?'

'কিচেনে যাব। খানিকটা ব্র্যাণ্ডি...'

'তুমি বোসো, আমি নিয়ে আসছি।' তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল নাদিরা।

'থ্যাঙ্কস, হানি।'

একটু পরই এক বোতল রেমি মার্টিন নিয়ে ফিরে এল সে।

গার্সিয়ার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে এক আউন্স মত ঢেলে ফিরিয়ে দিল আবার। চোখ বুজে ঝিমাচ্ছে লোকটা। মুখ না তুলেই বলল, 'চিয়ার্স!'

'চিয়ার্স। গার্সিয়া, তোমার ভয় করছে না?'

'ভয়! কেন?'

'তোমার দোকানেও যদি ডাকাতি হয় ডিভোল্টের মত?'

'হবে না,' জোরে জোরে মাথা দোলাল সে। 'অসম্ভব! হতে পারে না।'

'কেন পারে না? অ্যালার্ম আছে বলে? সে তো ওদেরও ছিল।'

অসংলগ্নের মত হাসল গার্সিয়া। 'ওরা বোকা।'

'অ্যাঁ?'

'আমার মত সাইলেন্ট অ্যালার্ম ছিল না ওদের।'

'কি ছিল না?' শক্ত হয়ে গেল নাদিরা। কান খাড়া।

'সাই...সাইলেন্ট অ্যালার্ম।'

'আচ্ছা!'

'ওগুলো অনেক নিরাপদ, ইউ নো?' ঘুম ঘুম কণ্ঠে বলল গার্সিয়া। 'টিপে দেব, সঙ্গে সঙ্গে জেনে যাবে পুলিস বা কোন প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সি। ভেতরে যদি অস্ত্রধারী ডাকাত থাকে, কিছুই টের পাবে না। যখন টের পাবে, তখন ঘেরাও অবস্থায় থাকবে তারা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ!' উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল নাদিরা।

'সাধারণ অ্যালার্ম বেজে উঠলে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে ওরা, এলোপাতাড়ি গোলাগুলি শুরু করে দেয়। অনেক নিরীহ মানুষ, আই মীন, কর্মচারী-ক্রেতা মারা যায়, ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড? সেই জন্যে...।' গ্লাসে লম্বা চুমুক দিল ইটালিয়ান।

'যাক,' স্বস্তির ভাব ফুটল ওর চেহারায়। হাই তুলল। 'নিজের

দোকানে সাইলেন্ট অ্যালার্ম সেট করে বুদ্ধিমানের কাজ করেছ তুমি। তোমার কোন ক্ষতি হলে আমি কষ্ট পাব।'

'গড ব্লেস ইউ, মাই চাইল্ড। সাইলেন্ট অ্যালার্মই নয় কেবল, তার চেয়েও অনেক আধুনিক ব্যবস্থা নিয়েছি আমি। অনেক আধুনিক।'

'তাই বুঝি?'

সোফা থেকে পিছলে কার্পেটে নেমে পড়ল গার্সিয়া। বেহেড মাতাল হয়ে গেছে। মানসিক প্রতিবন্ধীর মত মাথাটা ঘন ঘন নাড়তে লাগল সে হ্যাঁ সূচক ভঙ্গিতে। থেমে এক চুমুকে শেষ করল গ্লাস। পরক্ষণেই সেটা গলা পর্যন্ত ভরে দিল নাদিরা।

'আমার দোকানের ডিসপ্লে শো-কেসের পিছনে, চেয়ারের ব্যাক সমান উঁচুতে লম্বা স্টীলের রেইল লাগানো আছে দেয়ালে, দেখেছ?'

'দেখেছি।'

'ওটাই আমার আধুনিক অ্যালার্ম। স্বাভাবিক সময় ওই রেইল থেকে দূরে থাকি আমরা। বিপদ ঘটলে...ওই রেইলের সঙ্গে কোনভাবে দেহের যে কোন অংশের ছোঁয়া লাগাতে পারলেই অ্যাকটিভেট হবে অ্যালার্ম।'

থতমত খেয়ে গেল নাদিরা। মাসুদ রানার পরামর্শ মত লোকটাকে যদি মাতাল করতে না পারত ও, চরম সর্বনাশটা ঘটেই যেত। কোন পথ থাকত না ঠেকানোর। 'মাই গড! দারুণ বুদ্ধি তোমার! কিন্তু...কিন্তু পুলিস পৌঁছতে পৌঁছতে নিশ্চই দশ পনেরো মিনিট লাগবে। ততক্ষণে কাজ সেরে সরে পড়বে না ডাকাতরা?'

'উঁহুঁ!' আবার মাথা দুলতে শুরু করল গার্সিয়ার। 'পারবে না। কিছুতেই পারবে না।'

‘কেন পারবে না?’

খালি গ্লাসটা লোকটার শিথিল আঙুলের ফাঁক গলে মাখনের মত নরম কার্পেটের ওপর পড়ে গেল। শব্দ হলো না মোটেও। থুতনি বুকের সঙ্গে ঘষা খাচ্ছে গার্সিয়ার। যে কোন মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়বে মানুষটা। বাকিটুকু শোনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল নাদিরা।

‘গার্সিয়া!’ কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল ও। ‘কেন পালাতে পারবে না? আর কি বাধা আছে?’

অনেক কষ্টে মাথা তুলল লোকটা। ‘ইউ সী? সাইলেন্ট অ্যালার্ম। পুলিস পৌঁছে যাবে দশ-পনেরো...মিনিটের মধ্যে। ধরা...পড়ে যাবে সবাই।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ!’ মরীয়া হয়ে উঠল নাদিরা। আস্তে আস্তে কাত হয়ে যাচ্ছে গার্সিয়ার দেহ। ঘুমিয়ে পড়ছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল ও। কাঁধ ধরে দ্রুত কয়েকটা ঝাঁকি দিল লোকটাকে। মাসুদ রানার পরামর্শ গুলিয়ে গেছে। ‘কেমন করে ধরা পড়বে সবাই, বললে না?’

‘রেইল স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে...গেট...গেটও লক্ হয়ে যাবে, ইলেক্ট্রিক্যালি...হেভি ডবল গ্লাস...বুলেট প্রুফ...ইউ নো? যত চেষ্টাই করা হোক ভেতর থেকে...এক ঘ-ঘণ্টার আগে ওই...গেট ভাঙতে পারবে না কেউ। নো-ও-ও ওয়ে-এ-এ-এ!’ মাথা সোফায় এলিয়ে পড়ল লোকটার। মুহূর্তে তলিয়ে গেছে গভীর ঘুমে। নাকও ডাকছে একটু একটু। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

জানে শুনতে পাবে না, তবু উঁচু গলায় বলল নাদিরা, ‘চমৎকার, গার্সিয়া! দারুণ বুদ্ধি তোমার।’

আট

ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাতে জানাতে মুখ ব্যথা হয়ে গেল মাসুদ রানার। দয়া করে ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন না হত, সময়মত গার্সিয়া যদি ডিনারের নিমন্ত্রণ না জানাত মেয়েটাকে, পরিণতি কি হত ভেবে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে ওর থেকে থেকে।

প্ল্যান যে নিখুঁত ছিল মাসুদ রানার, নিশ্ছিদ্র ছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তারপরও সব ভেস্তে যেত কেবল ওই রেইলের খবর অজানা থাকার কারণে। কেবল অজানাই নয়, অকল্পনীয়ও ছিল ব্যাপারটা। অথচ গত দু'দিন রানা প্রায় নিশ্চিত জেনে বসে ছিল যে হুবহু একই পদ্ধতিতে সানফ্রান্সিসকোর ডিভোল্ট ব্রাদার্সে ঘটে যাওয়া সফল অপারেশনের মত ওদেরটাও সফল হবেই। কত বড় ফাঁড়া কেটে গেছে ভেবে আপাদমস্তক বারবার শিউরে উঠছে রানার। দ্রুত পায়ে ঘরের এ মাথা ও মাথা চক্কর দিয়ে ফিরতে লাগল ও। ভয়ানক গম্ভীর। কুঁচকে আছে কপাল।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে আছে নাদিরা। বুক কাঁপছে তার। এত গম্ভীর হতে পারে মাসুদ রানা, দেখেও বিশ্বাস হয় না। হঠাৎ ব্রেক কষল ও। ঘুরে তাকাল নাদিরার দিকে। 'তুমি শিওর, আর কোন সাইলেন্ট অ্যালার্ম সিস্টেমের কথা উল্লেখ করেনি গার্সিয়া?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল মেয়েটি। মাথা দোলাল। 'শিওর। করেনি।'

আবার পায়চারি শুরু করল রানা। হয়তো কথাটা সত্যিই হবে, আবার মিথ্যে হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। না, যায়, নিজের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল ও। তথ্যটা বেহেড মাতাল

অবস্থায় ফাঁস করেছে গার্সিয়া, সজ্ঞানে নয়। কাজেই আরও যদি কোন ব্যবস্থা থাকত, সেটাও বলে ফেলত ওই সঙ্গে।

আবার থেমে দাঁড়াল। 'তথ্যটা ফাঁস করার সময় পুরোপুরি মাতাল ছিল লোকটা, ঠিক?'

'সম্পূর্ণ মাতাল ছিল,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল মেয়েটি।

'কোন সন্দেহ নেই?'

'কোন সন্দেহ নেই। লোকটা হেভি ড্রিঙ্কার। প্রথম যেদিন ওর সঙ্গে রেস্টুরেন্টে ডিনার করি, সেদিনের কথা তো বলেইছি তোমাকে। লোকটা যেমন পেটুক, তেমনি ড্রিঙ্কার। খাবার যা খায়, তার দ্বিগুণ পান করে। কালও তাই করেছে। তাছাড়া কাল আমিও যথেষ্ট সাহায্য করেছি তাকে দ্রুত বেসামাল হতে। গ্লাস পুরো খালি হওয়ার আগেই নিজ হাতে ভরে দিয়েছি।'

'হুঁম!'

বাচ্চাদের একটা খেলনা প্রিন্টিং মেশিন কিনল মাসুদ রানা। ওটার সাহায্যে বিগ অ্যাপেল লণ্ড্রি অ্যাণ্ড ড্রাই ক্লিনার্সের নামে একটা ভিজিটিং কার্ড ছাপাল। ম্যানহাটনের এক পাবের ফোন নাম্বার দিল ওতে রানা। সময়মত নাদিরা থাকবে ওখানে, বনোমোর মালিক বা ম্যানেজার যদি ফোন করে নিশ্চিত হতে চায়, জবাব দেবে তার প্রশ্নের।

পরদিন সকাল দশটায় হোটেল থেকে বেরুল মাসুদ রানা। পরনে ডার্ক গ্রে কনজারভেটিভ স্যুট। ট্যাক্সি চেপে ফিফটি ফোর্থ অ্যাভিনিউ চলল ও। সেখানে ট্যাক্সি ছেড়ে হেঁটে পৌঁছল ইলেভেনথ স্ট্রীট। অফিসটা খুঁজে বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না।

মালিককেই পাওয়া গেল অফিসে। তাকে নিজের পরিচয় দিল

রানা বিগ অ্যাপেলের সেলস ম্যানেজার বলে। 'এই ব্যবসায় আমরা নতুন, স্যার। মাত্র কিছুদিন হলো নেমেছি,' বিনয়ের সঙ্গে বলল রানা।

'আই সী!' ওর ভিজিটিং কার্ডটা পড়ল বনোমোর মালিক। 'তা আমি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি, মিস্টার উডওয়ার্ড?'

'আমরা আমাদের এফিশিয়েন্সির প্রমাণ দেয়ার একটা সুযোগ চাই, স্যার। আপনার কোম্পানির ক্লীনারদের এক ডজন ইউনিফর্ম বিনে পয়সায় ধোলাই ও ইস্ত্রি করে দেয়ার একটা সুযোগ চাই।'

কার্ডটা নাড়াচাড়া করতে লাগল মালিক। 'ইউ মীন, কোন পয়সা লাগবে না?'

'না, স্যার। এক পয়সাও লাগবে না। আমাদের কাজ পছন্দ হলে পরেরবার দেবেন। বর্তমানে যে দরে কাজ করাচ্ছেন, তার থেকে দশ পার্সেন্ট কম দেবেন। তাতেই আমরা খুশি।'

'আই সী।' কিছু ভাবল লোকটা। 'আপনার এই ফোন নম্বরে রিঙ করলে নিশ্চই মাইণ্ড করবেন না আপনি?'

'হোয়াই!' চেহারায় অকৃত্রিম বিস্ময় ফোটাল মাসুদ রানা। 'অফকোর্স নট, স্যার। তাতে বরং খুশিই হব আমি।'

রিসিভার তুলে নাম্বারটা টিপল বোনোমোর মালিক। একবার রিঙ বাজতেই ওপাশ থেকে মিষ্টি মেয়ে-কণ্ঠ ভেসে এল, 'বিগ অ্যাপেল লণ্ড্রি অ্যাণ্ড ড্রাই ক্লিনিং কোম্পানি, গুড মর্নিং!'

'স্যাম উডওয়ার্ড নামে কেউ আছেন আপনাদের ওখানে?'

'ইয়েস, স্যার। আমাদের সেলস্ ম্যানেজার। কিন্তু এই মুহূর্তে অফিসের বাইরে আছেন উনি। আপনার যদি কোন মেসেজ থাকে মিস্টার উডওয়ার্ডকে দেয়ার, স্যার, অথবা যদি আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন...'

'না, ঠিক আছে।' ফোন রেখে দিল লোকটা। 'অল রাইট,

মিস্টার উডওয়ার্ড। প্রথমবার কোন পয়সা পাবেন না। তারপর কাজ বুঝে পেমেন্ট। ওকে?'

'ওকে, স্যার। থ্যাঙ্ক ইউ, ভেরি মাচ।'

এক ডজন আধ ময়লা হালকা নীল রঙের কভারলস্ একটা শপিং ব্যাগে পুরে তুলে দেয়া হলো ওর হাতে। ওগুলোর পিঠে বড় করে হলুদ রঙে লেখা: বনোমো ক্লিনিং সার্ভিস। বেরিয়ে এল রানা। খুশিতে মনে মনে লাফাচ্ছে।

বেনামে ভাড়া করা একটা ফোর্ড চালাচ্ছে নাদিরা। পাশে বসেছে মাসুদ রানা। পিছনের সীটে মুত্তাকিম এবং ত্রিরত্নের একজন, হাসান। ওদের পিছন পিছন আসছে অপর গাড়ি, শেভ্রোলে। ওটাও বেনামে ভাড়া করা। ওতে আছে ফয়েজ, সবুজ, এবং বিপুল। কাজটা ভালয় ভালয় শেষ হলে দুটো গাড়িই ফেলে পালাবে ওরা।

অবশেষে যাত্রা শুরু করেছে ওরা। আড়চোখে ঘড়ি দেখল নাদিরা, আটটা পাঁচ। সব যদি ঠিক থাকে, আর এক ঘণ্টার অল্প কয়েক মিনিট পরই সদলবলে রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সে চড়াও হবে মাসুদ রানা।

সময় যত ঘনিয়ে আসছে, ততই ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়ছে নাদিরা। বাড়ছে বুকের কাঁপুনি। কে জানে কি হয়! সফল হবে তো ওরা? নাকি ধরা পড়ে যাবে? চট্ করে মাসুদ রানার ওপর দিয়ে ঘুরে এল ওর দৃষ্টি। মুখটা মনে হলো পাথর কেটে গড়া। পনেরো সেকেণ্ড পর পর একবার ডানে, একবার বাঁয়ে তাকাচ্ছে ও। দু'পাশের ট্রাফিকের ওপর সতর্ক নজর রাখছে। চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ছাপ।

রানার ওই ডানে-বাঁয়ে করার সঙ্গে কিসের যেন মিল আছে,

ভাবতে গিয়ে গায়ের মধ্যে শিরশির করে উঠল নাদিরার। কিসের সঙ্গে যেন অদ্ভুত মিল আছে তার। কিসের সঙ্গে? হঠাৎ বুঝে ফেলল ও, সাপের সঙ্গে মিল আছে এ ভঙ্গির। ছোবল মারার আগে সাপের ফণা যেমন এদিক-ওদিক মৃদু দোল খায়, ঠিক তেমনি লাগছে রানার এই ভঙ্গি।

প্রত্যেকে দস্তানা পরে আছে ওরা। রওনা হওয়ার আগে গাড়ি দুটো থেকে ওদের হাতের ছাপ মুছে ফেলা হয়েছে যত্নের সঙ্গে। বাইরের নাক থেকে লেজ পর্যন্ত, আর ভেতরের স্টীয়ারিং হুইল, ডোর হ্যাণ্ডেল, ড্যাশ বোর্ড, মোট কথা এক ইঞ্চি জায়গাও বাদ রাখা হয়নি। ঘণ্টাখানেক ধরে কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে মুছে ফেলা হয়েছে সব খুব সতর্কতার সঙ্গে।

পালাবার মত পরিস্থিতি দেখা দিলে কাজে লাগবে বলে আরও দুটো গাড়ি তৈরি রেখেছে রানা ফর্টি সেভেনথ স্ট্রীটের সেই গ্যারেজে। দুটোরই লাইসেন্স প্লেটের একটা করে সংখ্যা গ্রীজের প্রলেপ লাগিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে।

দলের সবার সঙ্গে রয়েছে মোজার মুখোশ, টেপ, খানিকটা করে দড়ি ইত্যাদি কমন আইটেম। এছাড়া মুত্তাকিম, ফয়েজ ও হাসানের সঙ্গে আছে ক্রোবার এবং খাটো লোহার পাইপ। মাসুদ রানার পকেটে আছে দুটো ডোর স্পার। এছাড়া সবার সঙ্গেই রয়েছে তিনটে করে কাপড়ের ব্যাগ। সবাই সশস্ত্র।

গাড়িতে ওঠার আগে সবাইকে আলাদা আলাদা চেক করে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে রানা। নাদিরার মনে হয়েছে, যুদ্ধে যাওয়ার আগে অস্ত্র গোলা-বারুদ সৈনিকরা ঠিক মত সঙ্গে নিয়েছে কি না পরখ করে দেখছে ক্যাপটেন। সবশেষে রানাসহ তিনজন বাদে অন্য সবাই নাকের নিচে লাগিয়ে নিয়েছে নকল চওড়া গোঁফ। রানার ডান গালের আঁচিলটা এখনও আছে স্বস্থানে। সবুজ আর

বিপুলের প্রয়োজন হয়নি গোঁফ, কারণ ওদের আসল গোঁফ আছে। ওদের বরং সেগুলো খোয়াতে হবে পরে। কাজ শেষ হলে।

বাঁক নিয়ে ম্যাডিসন অ্যাভিনিউতে এসে উঠল নাদিরা। সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তা চেপে বসল আবার। যদি সফল না হয় ওরা? যদি ধরা পড়ে যায়? কি হবে তখন? তবে কথাবার্তায় মাসুদ রানাকে বেশ আস্থাশীল মনে হয়েছে ওর। রানার ধারণা, সাইলেন্ট অ্যালার্মের গোমর যখন জানা গেছে, আর কোন আশঙ্কা নেই। মিশন সফল হবেই।

রানার আস্থা প্রভাবিত করেছে অন্যদের, এমনকি ওকেও। অনেক সময় জুয়াড়ীদের মধ্যে এ ধরনের আস্থা দেখেছে নাদিরা, খেলতে বসার আগে কি করে যেন টের পায় তারা আসন্ন দান তাদের জন্যে জয় বয়ে আনবে। শিকারিদের ভেতরেও দেখেছে। শিকারে যাওয়ার আগেই বুঝে ফেলে তারা ভাগ্য কোনদিন প্রসন্ন থাকবে। যাত্রার শুরুতে নাদিরাও ব্যাপারটা কিছু কিছু টের পেয়েছে।

কোথাও কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি ওদের। কেউ লিফট চায়নি ওদের কাছে, কোন পরিচিত লোকের মুখোমুখি পড়ে গিয়ে খেজুরে আলাপে অংশ নিতে হয়নি। পুরোপুরি বাধাহীনভাবে এ পর্যন্ত আসতে পেরেছে ওরা। অতএব আশা করা যেতে পারে, যে কাজে আসা সেটাও কোনরকম বিঘ্ন ছাড়াই সম্পন্ন হবে।

দূর থেকে অ্যান্টিক শপটা চোখে পড়ল সবার। 'একটু আস্তে করো,' বলল মাসুদ রানা। 'ওদের আরেকটু কাছে আসার সুযোগ দাও,' পিছনের শেভ্রোলে ইঙ্গিত করল ও।

অ্যাক্সিলারেটরে পায়ের চাপ কমাল নাদিরা। আরও সতর্ক মনোযোগ দিল ড্রাইভিঙে। 'হ্যাঁ, এইভাবে,' প্রশংসার সুরে বলল

রানা। 'আস্তে আস্তে যাও।'

ফিফটি থার্ড স্ট্রীটে পড়ল ফোর্ড। অ্যান্টিক শপের সামনে খালি, পৌঁছায়নি এখনও বনোমো ভ্যান। 'শিট,' গাল পাড়ল রানা। 'আরেক চক্কর ঘুরে আসা যাক পুরো ব্লক।'

তাই করল নাদিরা। অ্যান্টিক শপের সামনে দিয়ে উত্তরে চলল। পার্ক অ্যাভিনিউ হয়ে ফিফটি ফোর্থ স্ট্রীট, তারপর দক্ষিণে। আবার ম্যাডিসন হয়ে ফিফটি থার্ডে। ঠিক পিছন পিছন আসছে শেভ্রোলে।

এখনও দেখা নেই বনোমো ভ্যানের।

'ওরা দেরি করে ফেলেছে আজ,' ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে বলল মাসুদ রানা হালকা স্বরে। 'মিনিট তিনেক।'

ওর কণ্ঠে কোন হতাশা নেই বুঝতে পেরে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল নাদিরা। মনের ভেতর জমে ওঠা হালকা ধোঁয়ার মেঘ কেটে গেল দ্রুত।

'আরেক চক্কর, নাদিরা।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে পালন করল সে নির্দেশটা। ঘুরে এল ব্লক। তারপর আরও একবার। একটু একটু করে বাড়তে আরম্ভ করেছে ট্রাফিকের চাপ। সাইড ওয়াক পুরোপুরি অফিস যাত্রীদের দখলে চলে গেছে। একটা দুটো করে দোকান-পাট প্রায় সবই খুলে গেছে। প্রতিটি ক্রসিঙে পথচারীদের পারাপারে সুবিধে করে দেয়ার জন্যে জায়গামত ফিরে আসতে দেরি হয়ে গেল এবার। দু'মিনিটের পথ অতিক্রম করতে চার মিনিট লাগল। শেষ বাঁক ঘুরে ম্যাডিসনে উঠল ফোর্ড।

এবং ভ্যানটার ওপর চোখ পড়ল সবার একসঙ্গে। অ্যান্টিক শপের সামনে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। কেউ নেই ওতে। আরেকটু কাছে এগোতে বোঝা গেল, ঠিক দোকানের সামনেই

নয়, জায়গার অভাবে আট-দশ গজ দূরে দাঁড়াতে হয়েছে আজ ওটাকে।

'একেই বলে ভাগ্য,' বিড়বিড় করে বলল মুত্তাকিম। 'জানালা দিয়ে ভেতর থেকে কেউ উঁকি দিলেও ভ্যানটা দেখতে পাবে না।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রানা। 'লক্ষণ ভালই।' ওটা যখন আর পঞ্চাশ গজ সামনে, নড়ে উঠল মাসুদ রানা। 'হাত চালাও,' সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল ও।

বসে বসেই ঝট্‌পট্‌ কাপড় চোপড় খুলে ফেলল ওরা। নিচে পরা আছে বনোমো কভারলস্‌। শার্ট, প্যান্ট, কোট সব রেডিমেড, গতকালই কেনা হয়েছে। ওগুলো যার যার পায়ের কাছে দলা করে রাখল ওরা। ইউনিফর্মে পকেটের সংখ্যা বেশুমার। ওগুলো হাতড়ে জিনিসপত্র সব ঠিক আছে কি না চেক করে নিল সবাই। তারপর রানার দেখাদেখি সবার হাতে বেরিয়ে এল একটা করে স্কিন কালারের টাইট মোজা।

'ভ্যানের সামনে থামো,' নির্দেশ দিল মাসুদ রানা। 'ওটার পাঁচ ফুট তফাতে দাঁড়াও। এঞ্জিন বন্ধ করবে না।'

তাই করল নাদিরা। অ্যাকশন শুরু হতে যাচ্ছে ভেবে আবার কাঁপুনি উঠে গেল। ওরই ফাঁকে রিয়ার ভিউ মিররে চোখ পড়ল ওর। শেভ্রোলেটাকে দেখা গেল, ওদের পাঁচ ফুট পিছনে থেমে দাঁড়িয়েছে ওরা। দুটো গাড়ির মাঝখানে জায়গা খুব সামান্যই।

'গুড, গুড,' মৃদু স্বরে, আনমনে বলল রানা। নড়ল না ও। বসে থাকল চুপ করে। ওর দেখাদেখি পিছনের ওরাও বসে আছে তৈরি হয়ে। নড়ছে না কেউ। গাড়ি থেকে নামার কোন ব্যস্ততা নেই। যেন বসে থাকতেই এসেছে ওরা সবাই। এক এক করে মিনিট পেরিয়ে যেতে লাগল।

পাথরের মূর্তির মত বসে আছে সবাই। অ্যাভিনিউর ওপাশ দিয়ে একটা স্কোয়াড কার চলে গেল ধীরগতিতে। ভেতরে দুজন পুলিস বসা, একবারও এদিকে তাকাল না তারা। পেট্রলম্যান চোখে পড়ল না রানার একজনও। ঝাড়া দশ মিনিট অপেক্ষা করল ও। তারপর আলতো করে হাত রাখল ডোর হ্যাণ্ডেলে।

'এইবার!' মৃদু, চাপা কণ্ঠে নির্দেশ দিল ও। 'বেরোও!'

পিছনের দু'জন মাথা দোলাল। বেরিয়ে পড়ল ধীরস্থির ভঙ্গিতে। ওদের দেখাদেখি পিছনের গাড়ির তিনজনও নেমে পড়ল, তারপর একযোগে পা বাড়াল সবাই ভ্যানের দিকে। তাড়াহুড়ার লেশমাত্র নেই কারও আচরণে, বরং গল্প করছে তারা নিজেদের মধ্যে, হাসাহাসি করছে। দুনিয়ার কোনওদিকে নজর নেই।

ভ্যানের পিছনে গিয়ে থামল পাঁচজনের দলটা। হাসিমুখে পিছনের পাল্লা খুলল মুত্তাকিম বিল্লাহ, উঠে পড়ল সবাই ভেতরে। বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা। এমন স্বাভাবিক ভাবে ঘটে গেল পুরোটা যে বিশ্বাসই হতে চায় না। পথচারীদের অনেকেই দেখেছে ওদের। কিন্তু একবারের বেশি দু'বার তাকায়নি। সব যখন স্বাভাবিক, তাকানোর কথাও নয়।

'চমৎকার,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা। এখনও গাড়ি ত্যাগ করেনি ও। 'কি বলো! দারুণ দেখিয়েছে ওরা।'

ঘুরে তাকাল নাদিরা। ফ্যাকাসে হাসি মুখে।

'ভয় পেলে?'

'হ্যাঁ। তোমাদের কথা ভেবে।'

'চিন্তা কোরো না,' মেয়েটির কাঁধে মৃদু চাপড় লাগাল রানা। 'ঠিকই উৎরে যাব আমরা।'

অবাক হয়ে নতুন চোখে রানাকে দেখতে লাগল ও। এর

মধ্যেও কি করে মাথা ঠাণ্ডা রাখে মানুষ? চেহারায় সন্তুষ্টির ভাব নিয়ে সামনে তাকিয়ে আছে মাসুদ রানা। ভ্যানের ভেতরে কি করছে ওরা যেন দেখতে পাচ্ছে দিব্য চোখে। মোজার মুখোশ এতক্ষণে নিশ্চই পরে ফেলেছে সবাই, ভাবছে ও। এবং অস্ত্র নিয়ে দরজার সামনে এসে অবস্থান নিয়েছে মুত্তাকিম, বনোমোর ড্রাইভার হেলপারকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে।

আরও দশ মিনিট কাটল নীরবে। তারপর সোজা হয়ে গেল রানা। 'ওই আসছে।'

ঝট্ করে সামনে তাকাল মেয়েটি। অ্যান্টিক শপ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল বনোমোর ওদের।

দরজা খুলে এক পা রাস্তায় নামিয়ে দিল মাসুদ রানা। কোন ব্যস্ততা নেই। ওই দু'জনের ভ্যানের পিছন দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে হবে, তারপর...

এগিয়ে গেল লোক দুটো, হেলপার লোকটা টান দিল দরজার হাতল ধরে। এবং সঙ্গে সঙ্গে জমে গেল বরফের মত। মাত্র কয়েক ইঞ্চি তফাতে মূর্তিমান মৃত্যু অপেক্ষা করছে। আহাম্মকের মত চেয়ে থাকল ওরা মুত্তাকিম বিল্লাহর হাতে ধরা জিনিসটার দিকে। পিছনে খুক্ কাশির আওয়াজে সচকিত হলো তারা, ঘুরে তাকাল। পরক্ষণে আঁতকে উঠল মাসুদ রানা আর ওর হাতের ওয়ালথার দেখে।

'গেট আপ্!' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল রানা।

ওপর থেকে হাত বাড়াল ফয়েজ আহমেদ। এক এক করে তুলে নিল ওদের তিনজনকে। নাকের সামনে দু-দুটো অস্ত্র দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে লোক দুটো। বিন্দুমাত্র ট্যাঁ-ফোঁ করেনি, উঠে পড়েছে ভাল মানুষের মত। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

এক মিনিট পর খুলে গেল আবার। নেমে এল ভ্যান ড্রাইভার

ও মাসুদ রানা। সবক যা দেয়ার, এর মধ্যে দিয়ে ফেলেছে ও ড্রাইভারকে। তারও ব্যাপারটা হজমে দেরি হয়নি। ক্যাবের দিকে হাঁটছে ড্রাইভার ধীর পায়ে, তার ঠিক পিছনেই রয়েছে রানা। ডান হাত কভারলের পকেটে। সমান তালে পা ফেলে ভ্যানের সামনের দিকে পৌঁছল ওরা, প্যাসেঞ্জার'স সাইডে। দরজা খুলে ড্রাইভার উঠল প্রথমে, পিছলে চলে গেল নিজের আসনে। তারপর উঠল মাসুদ রানা। দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা।

ঘড়ি দেখল নাদিরা, আটটা তেপ্পান্ন। ঢোক গিলল ও। কান দিয়ে গরম ভাপ বেরুতে আরম্ভ করেছে। ভোঁ ভোঁ করছে মাথার ভেতর। প্রচণ্ড উত্তেজনায় সারা দেহ কাঁপছে ওর। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ভ্যান, নড়ছে না। দেরি করছে রানা ইচ্ছে করেই।

আটটা সাতান্ন মিনিটে বনোমো ভ্যানের একজস্ট পাইপ দিয়ে এক ঝলক সাদা ধোঁয়া বেরোতে দেখল নাদিরা, স্টার্ট নিয়েছে। ব্যাক লাইট জ্বেলে খুব সাবধানে, আস্তে আস্তে পিছিয়ে এল ভ্যান। খোলা জায়গায় এসে ঘুরল, তারপর ঢুকে পড়ল দক্ষিণমুখো ট্রাফিকে।

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ড্রাইভারের মুখটা সামান্য সময়ের জন্যে দেখতে পেল নাদিরা। চকের মত সাদা হয়ে গেছে মানুষটা, নিচের ঠোঁট কাঁপছে থর থর করে। মনে হলো এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে বুঝি। হঠাৎ ভীষণভাবে চমকে উঠল ও দূর থেকে কয়েকটা সাইরেনের আওয়াজ শুনে। পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিক থেকে আসছে আওয়াজগুলো।

পরক্ষণেই লজ্জা পেয়ে গেল নাদিরা নিজের ছেলেমানুষির কারণে। আওয়াজটা কেন উঠেছে ভালই জানে ও। ঠিক সময়মত এই এলাকার স্কোয়াড কার আর ফায়ার ফাইটারগুলোকে ব্যস্ত রাখার জন্যে আগেই ফন্দি এঁটে রেখেছিল রানা। কথা ছিল,

সময়মত শওকত ফোনে ওদের জানাবে যে আগুন লেগেছে রকফেলার সেন্টারে। তাই ঘটেছে। মিথ্যে আগুন লাগার খবর পেয়ে ছুটছে ওরা।

চমৎকার ব্যবস্থা। সময়মত এদিকে পুলিস যত কম থাকে, ততই ওদের লাভ। ভ্যানের পিছন পিছন ফিফটি ফিফথ স্ট্রীটে পৌঁছল নাদিরা। শেভ্রোলে পড়ে থাকল অ্যান্টিক শপের সামনে। ওটাকে আর প্রয়োজন নেই। তারপর রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সের সামনের নির্দিষ্ট জায়গায় থেমে দাঁড়াল ভ্যান। ওটার কয়েক গজ দূরে, একটা নির্মাণ সামগ্রী খালাসে ব্যস্ত ট্রাকের আড়ালে ফোর্ড দাঁড় করাল নাদিরা। দু'চোখে গভীর আগ্রহ, সেই সঙ্গে ভয় নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। আয়নায় চোখ রেখে পিছনটা দেখছে।

বনোমো ড্রাইভার এবং মাসুদ রানা বেরিয়ে এল ভ্যান থেকে, ড্রাইভার'স ডোর দিয়ে। পাশাপাশি হেঁটে ভ্যানের পিছনে পৌঁছল দুজনে। পাল্লা খুলে ভেতর থেকে একটা ক্যানিস্টার টাইপ ভ্যাকিউম ক্লিনার ও লাঠির মাথায় ন্যাকড়া বাঁধা ঝাড়ন নিল ড্রাইভার। রানা নিল একটা গারবেজ বাকেট। অন্য হাত এখনও কভারলের পকেটে ওর।

দ্রুত পা চালাল ওরা রবার্টো গার্সিয়ার দিকে। বন্ধ গেটের সামনে পৌঁছে দাঁড়াল। দম বন্ধ করে দেখছে নাদিরা দৃশ্যটা, দৃষ্টি বিস্ফারিত। এক মুহূর্ত মাত্র, খুলে গেল দরজা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভ্যানের পিছন দরজাও পুরোপুরি খুলে গেল। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ভেতরের পাঁচজন। মুখে সবার মোজার মুখোশ। রংটা চামড়ার রঙের হওয়ায় ভাল করে না তাকালে বোঝা যায় না। মাথা নিচু করে খুব দ্রুত ভ্যান আর রবার্টো গার্সিয়ার মাঝের দূরত্ব পেরিয়ে গেল ওরা।

পুরোটা এত চমৎকারভাবে ঘটে গেল, আশপাশের কেউ কিচ্ছুটি টের পেল না। মাসুদ রানা দোকানের ভেতরে দু'পা এগোনোর আগেই পৌঁছে গেল রেজিমেন্টের অন্যরা। বন্ধ হয়ে গেল গেট।

ওরা সবাই এখন রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সের ভেতরে।

ওদিকে, যে মুহূর্তে দোকানের গেট খুলে গেল, মাসুদ রানার বাঁ হাতের প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় করে ভেতরে গিয়ে আছড়ে পড়ল ড্রাইভার। ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে চিৎ হয়ে পড়ে গেল হতভম্ব গার্সিয়ার সামনে।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সে সবিস্ময়ে, কিন্তু সময় পেল না। পলকে পকেট থেকে পিস্তল বের করেই ঠেসে ধরেছে রানা তার নাকের ডগায়। চোখ কপালে উঠল গার্সিয়ার, হাঁ হয়ে গেল মুখ। ওদিকে আরও কয়েকজন মুখোশ পরা ডাকাত ঢুকে পড়েছে ভেতরে। কোন চিৎকার নেই, চেঁচামেচি নেই, ভয় পেয়ে দৌড় ঝাঁপ নেই। মাসুদ রানার লেখা স্ক্রিপ্ট অনুযায়ীই সব ঘটতে লাগল পর পর।

মুত্তাকিম বিল্লাহ এবং হাসান ছুটল খোলা ভল্ট রূমের দিকে। এত দ্রুত জায়গামত পৌঁছে গেল ওরা, তখনও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি সামনের দরজা। সেফ রূমে ছিল দুই কারিগর, তাদের নিয়ে আসা হলো সামনে। এবং প্রত্যেককে শো রূমের ঠিক মাঝখানে জড়ো করা হলো। সতর্ক নজর রাখা হলো কেউ দেয়ালের ধারে কাছে যায় কি না, নায়ক হওয়ার চেষ্টা করে কি না।

চোখমুখ কুঁচকে মাসুদ রানা আর মুত্তাকিম বিল্লাহর দিকে পালা করে তাকাতে লাগল গার্সিয়া। 'তোমরা ভুল করছ,' গম্ভীর গলায় বলল সে। 'মারাত্মক ভুল করছ তোমরা।'

কেউ উত্তর দিল না ওরা। ইশারায় কর্মচারীদের হাঁটু গেড়ে

মেঝেতে বসে পড়তে বলল রানা। একবার ভয়ে ভয়ে মালিকের দিকে তাকাল তারা, তারপর বসে পড়ল নির্দেশমত। ঝটপট হাত-পা বেঁধে টেপ দিয়ে মুখ আটকে দেয়া হলো প্রত্যেকের। এরপর সার্চ করা হলো তাদের। একজন সেলসম্যান এবং একজন কারিগরের পকেটে পাওয়া গেল ট্র্যান্সমিটার অ্যালার্ম, বোঝাগুলো হালকা করে দেয়া হলো।

এছাড়া প্রত্যেকের পকেটেই একটা করে মিনি পিস্তল ছিল, সেগুলো সব নিজের পকেটে ভরল ফয়েজ আহমেদ। এবার বনোমো ড্রাইভারকেও ওদের মধ্যে বসিয়ে বেঁধে ফেলা হলো।

আবার কথা বলে উঠল গার্সিয়া, 'তোমরা জানো না কার দোকানে ডাকাতি করতে এসেছ,' প্রায় ধমকের সুরে বলল সে। 'এখনও সময় আছে, পালিয়ে যাও। কিছু বলব না আমি…।' কথাটা শেষ করতে পারল না সে। টেপ দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হলো তার কথা বেরোবার রাস্তা। তারপর আসল কাজে নামল মাসুদ রানা।

কাজ আগে থেকেই ভাগ করে দিয়েছিল ও। কাজেই কাউকে নতুন করে কিছু বলতে হলো না, যার যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। মাসুদ রানা থাকল গার্সিয়া এবং অন্যদের পাহারায়।

বাকিদের মধ্যে দু'জন গিয়ে ঢুকল সেফ রূমে, অন্যরা পিস্তলের বাঁট দিয়ে ঠুকে ঠুকে শো কেসের কাঁচ ভাঙতে শুরু করল। ভেতরে সাজিয়ে রাখা সুদৃশ্য চামড়ার প্যাকেটগুলো টপাটপ ভরে ফেলতে লাগল নিজ নিজ হাত ব্যাগে। বাছাবাছির, দেখাদেখির সময় নেই। শোকেস ঝেঁটিয়ে বের করে নিয়ে আসা হলো সব। চারটে বড় বড় হাত ব্যাগ ভরে গেল।

ওদিকে পিছনের ভল্টও খালি করে ফেলেছে মুত্তাকিম ও ফয়েজ। মাঝে মধ্যে মাসুদ রানাও হাত লাগাচ্ছে ওদের সঙ্গে।

ওরই মাঝে থেকে থেকে হাতঘড়ি দেখে সতর্ক করছে সঙ্গীদের।

'পনেরো মিনিট।'

'দশ মিনিট।'

'আর মাত্র পাঁচ মিনিট।'

দ্রুত হাত চালাচ্ছে সবাই। ঘাম ছুটে গেছে প্রত্যেকের। শো কেস শেষ করে এবার উইণ্ডো কেস নিয়ে পড়ল ওরা। দেখতে দেখতে আটটা ব্যাগ পুরোপুরি ভর্তি হয়ে গেল।

'হাত চালাও, হাত চালাও!' ব্যস্ত গলায় বলল মাসুদ রানা। 'সময় নেই। কুইক!' গার্সিয়ার ওপর খেপে আছে ও আসলে। ফার্নিচার আর কারিগরি সরঞ্জাম ছাড়া বিক্রি করার মত আর কিছু যাতে খুঁজে না পায় লোকটা দোকানে, নিশ্চিত করতে চায় তা।

দ্বিগুণ গতিতে হাত চালাচ্ছে অন্যরা। শো কেস, উইণ্ডো কেস, পিছনের সেফ সব একদম ফাঁকা করে তবে থামল। 'আর এক মিনিট!'

'হয়ে গেছে,' ঘোষণা করল বিল্লাহ।

'গুড।'

লুটের মাল ভর্তি ব্যাগগুলো এক এক করে দরজার সামনে এনে জড়ো করা হলো। মোট চোদ্দটা ব্যাগ। প্রতিটা প্রমাণ সাইজ বালিশের খোলের সমান। ওজন অস্বাভাবিক। পরীক্ষা করে দেখল মাসুদ রানা। একবারে নিয়ে বের হওয়া কঠিন। কিন্তু কাজ একবারেই সারতে হবে। 'বিল্লাহ, চারটে নাও। তোমরা দুটো করে। বিল্লাহ, হাসান, ফয়েজ ভ্যানে উঠবে। সবুজ, বিপুল আমাদের ব্যাক সীটে। আমি পিছনে থাকব সবার। সোজা, সহজভাবে গিয়ে গাড়িতে ওঠো। নো ওয়াইল্ড রানিং, বাট মুভ ফাস্ট। লেটস গো।'

হাসান বেরুল প্রথমে। দু'হাতে দুই ব্যাগ। তার পিছনে

বিল্লাহ, দুই হাতে দুটো করে ব্যাগ তার। ওদের পর ফয়েজ আহমেদ। এক হাতে দুটো ব্যাগ বইছে সে, অন্য হাত কভারলসের পকেটে। কয়েক পা এগিয়ে ভ্যানের পিছনে দাঁড়াল ওরা। দরজা খুলে ভেতরে ছুঁড়ে মারল ব্যাগগুলো। হাসান আর ফয়েজ উঠে পড়ল পিছনে, টেনে লাগিয়ে দিল দরজা। বিল্লাহ ধীর স্থির ভঙ্গিতে ড্রাইভারের সীটে গিয়ে বসল।

পুরো ব্যাপারটা ঘটল অজস্র পথচারীর চোখের সামনে। কেউ কিছু সন্দেহ করল না। করার কথাও নয়। তিন ক্লিনার কাজ সেরে নিজেদের গাড়িতে ফিরছে, এতে সন্দেহের কি আছে?

এবার বেরুল সবুজ ও বিপুল। দুই পা আন্দাজ সামনে পিছনে আছে ওরা। দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে ফোর্ডের দিকে এগোল। পলকহীন চোখে ওদের দেখছে নাদিরা। কাছে এসে একটা ব্যাগ রাস্তায় নামিয়ে রাখল সবুজ, মেলে ধরল এপাশের দরজা, তারপর ওগুলো ধুপ্ ধাপ্ ভেতরে ছুঁড়ে মেরে নিজেরাও উঠে পড়ল।

‘স্টার্ট দিন,’ বলল বিপুল। ‘এখনই এসে পড়বেন মাসুদ ভাই।’

চাবি ঘোরাল নাদিরা, মৃদু আওয়াজ তুলে স্টার্ট নিল ফোর্ড। ঘুরে তাকাল রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সের দিকে। ইটালিয়ান ডাকাতটার চেহারা এই মুহূর্তে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে ওর। দু’হাতে দুটো থলে নিয়ে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা।

গেটের পাশেই দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল ও দুটো। মোজার মুখোশ খুলে ফেলল চট্ করে, তারপরই ঝুঁকে দাঁড়াল, যেন জুতোর ফিতে বাঁধছে। দূরে থেকে ওর ডানহাতের ত্বরিত আগুপিছু দেখতে পেল নাদিরা, রাবারের ডোর স্পার দরজার নিচে গুঁজে দিয়েই সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। ব্যাগ দুটো

নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। আর ঠিক তখনই ধাক্কাটা খেল।

মুখ তুলল মাসুদ রানা। কমপ্লিট সুট পরা স্মার্ট এক যুবক, ওর থেকে কম করেও তিন ইঞ্চি দীর্ঘ। ব্যায়ামপুষ্ট শরীর। বাঁ হাতের কব্জির সঙ্গে একটা কালো ব্রিফকেস হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে আটকানো রয়েছে তার। এরই সঙ্গে খেয়েছে ও ধাক্কাটা। দোকানে ঢুকতে যাচ্ছিল যুবক, ধাক্কা খেয়ে থেমে পড়েছে। মাসুদ রানাকে তার উদ্দেশে ক্ষমা প্রার্থনার হাসি দিতে দেখল নাদিরা, দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল যুবক।

ফোর্ডের দিকে এগোল মাসুদ রানা। কোনরকম ব্যস্ততা নেই। ওদিকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যুবক, নড়ছে না। চোখ কুঁচকে চেয়ে আছে রানার দিকে। ফোর্ডের পিছন দিয়ে ঘুরে এপাশের আড়ালে চলে এল মাসুদ রানা, চট্ করে পিছনের দরজা খুলে ওর হাত থেকে ব্যাগ দুটো নিল বিপুল। এক পা এগিয়ে সামনের দরজা খুলল রানা, উঠে বসল নাদিরার পাশে। ভেতরে ঢোকার আগে আড়চোখে যুবককে দেখে নিয়েছে ও, এখনও এদিকেই তাকিয়ে আছে সে। আগেই বুঝেছে রানা, ওই যুবক গার্সিয়ার জুয়েলারি-সেলসম্যান।

নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজন পড়ল না। সময়ের গুরুত্ব বুঝে নিয়েছে নাদিরা আগেই। গিয়ার দিয়েই অ্যাক্সিলারেটর চেপে ধরল সে। 'ডোণ্ট প্যানিক,' ঠোঁট না নাড়িয়ে বলল রানা। 'স্বাভাবিকভাবে এগোও।'

এখনও স্থির দাঁড়িয়ে সেলসম্যান। দ্বিধা কাটেনি। কিন্তু ফোর্ড নড়তে শুরু করামাত্র কাটল। ঝট্ করে একবার দোকানের বন্ধ দরজার দিকে তাকাল, তারপর কি ভেবে এগিয়ে গেল কাছে। উঁকি দিল ভেতরে। পরমুহূর্তে লাফ দিল যুবক, বসে পড়ল এক হাঁটুতে ভর দিয়ে। কোন ফাঁকে ডান হাতে একটা পিস্তল বেরিয়ে

এসেছে তার। ওটা তুলল ফোর্ড লক্ষ্য করে।

একই সময় সামনে বাড়ল বনোমো ভ্যান। এবং যেন ওদের পালাতে সাহায্য করার জন্যেই ইস্ট ফিফটি ফিফথের সামনের লাল ট্রাফিক সিগন্যাল সবুজ হয়ে গেল। নিশ্চল ট্রাফিক এগোতে শুরু করল।

গুলির শব্দে কেঁপে উঠল পুরো এলাকা। চমকে উঠে থেমে দাঁড়াল পথচারীরা, কেউ কেউ চট্ করে বসে পড়ল পথে। আবার গুলি করল সেলসম্যান, পিছনের উইণ্ডশীল্ড ফুটো করে ফোর্ডের গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল বুলেট। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল নাদিরা।

'ভয় পেয়ো না,' নিজেই পেয়েছে ভয়, কিন্তু তা প্রকাশ হতে দিল না মাসুদ রানা। গলা যথাসম্ভব শান্ত রেখে বলল, 'চালিয়ে যাও।'

আবার গুলি ছুঁড়ল যুবক, এবার ভ্যান লক্ষ্য করে। স্টীলের দেহে লেগে 'ঠং' আওয়াজ তুলল বুলেটটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল ভ্যানের পিছন দরজা। কে খুলল দেখতে পেল না রানা। যে-ই হোক, তাকে সতর্ক করার বা গুলি ছুঁড়তে বারণ করার কোন সুযোগও পেল না ও। পর পর তিনটে গুলির আওয়াজ কানে এল রানার। শেষ বিস্ফোরণের পরমুহূর্তে সেলসম্যানের পিস্তল ধরা হাতটা শূন্যে লাফিয়ে উঠতে দেখল রানা।

নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসে উঠল ও, 'ইডিয়ট!'

আকাশ ভেঙে পড়েছে যেন ফিফটি ফিফথ ইস্টে। চতুর্দিকে শুরু হয়ে গেল চেঁচামেচি। সঙ্গে গাড়ির হর্ন আর ব্রেক চাপার বিকট আওয়াজে নরক গুলজার। ধীরগতিতে এগোতে থাকা ট্রাফিক খানিক থমকে দাঁড়াল, পরক্ষণেই গ্রাঁ প্রি ট্রফি জেতার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল চালকরা।

ভ্যানের রং সাইড দিয়ে সামনে যেতে চাইছিল এক ট্যাক্সি, ড্যাশ মেরে পাঁচ ফুট দূরে হটিয়ে দিল ওটাকে বিল্লাহ, তারপর ছুটল। চারদিকে মহা হুলুস্থূল পড়ে গেছে। ওরই মধ্যে থেকে পথ বের করে নিয়ে আগে আগে ছুটল ভ্যান। তার পিছনেই রয়েছে ফোর্ড। ভ্যানের তৈরি পথ ধরে ছুটছে।

ফিফটি ফিফথের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছল ওরা। ভয় পেয়ে গিয়েছিল নাদিরা, ভেবেছিল আর উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তেই হলো। কিন্তু সামনেই বিস্তৃত সিক্সথ অ্যাভিনিউ দেখে ধড়ে প্রাণ ফিরে এল ওর। ফোর্ড ছোটাল সে তুফান বেগে।

'কারও লেগেছে?' পিছন না ফিরে বলল মাসুদ রানা।

'না, মাসুদ ভাই,' বলল সবুজ। 'আমাদের কারও লাগেনি।'

নয়

ভ্যান ছিল আগে, তাই আগেই পৌঁছল ওটা ওয়েস্ট ফর্টি সেভেনথ স্ট্রীটের পরিত্যক্ত গ্যারেজে। গেট বন্ধ করে বসেছিল ওরা ফোর্ডের অপেক্ষায়। এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে ফুটো দিয়ে বাইরেটা দেখল বিল্লাহ, তারপর খুলে দিল গেট।

'সমস্যা হয়ে গেছে, মাসুদ ভাই।' ওকে বেরুতে দেখেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল সে।

আস্তে করে নকল আঁচিল আর গোঁফটা তুলে ফেলল মাসুদ রানা। কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল এক পায়ে ভর দিয়ে। দু'হাত কোমরে। তাকিয়ে আছে ভ্যানের দিকে। পিছনের একটা পাল্লা খোলা ওটার। ওপর দিকের আট বাই আট ইঞ্চি কাঁচের জানালা চুরমার হয়ে গেছে গুলির আঘাতে। নিচের দিকে বেশ কাছাকাছি

দুটো বুলেটের গর্ত দেখা গেল একটা পাল্লার গায়ে। নাদিরা এসে দাঁড়াল রানার পাশে।

'গুলি খেয়েছে কেউ?' প্রশ্ন করল রানা।

'হ্যাঁ, দু'জন।'

চাউনি সরু হয়ে এল মাসুদ রানার। 'কে কে?'

'প্রথমে খেয়েছে বনোমো হেলপার। ফ্লোরে শুয়ে থাকা অবস্থায়ই গুলি খেয়েছে লোকটা, সরাসরি মাথায় লেগেছে। স্পট ডেড।'

'আর?'

'হাসান। দুটো গুলি খেয়েছে। একটা মারাত্মক। মারা যাচ্ছে ও।'

মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। 'চলো দেখি!'

টেইল বোর্ডে পা রেখে উঠে পড়ল রানা ভ্যানে। বিল্লাহ এবং নাদিরাও উঠল। ফ্লোরে চোখ পড়তে থমকে দাঁড়াল রানা। দুই চোখের কোণ বিশ্রীভাবে কুঁচকে উঠল। রক্ত থৈ থৈ করছে ফ্লোরে। মনে হয় যেন কোন কসাইখানা এটা। তার ওপর পড়ে আছে হাত-পা বাঁধা, মুখে টেপ সাঁটা হতভাগ্য বনোমো হেলপার।

দু'চোখ খোলা তার, বিস্ফারিত। চাউনিতে ফুটে আছে আতঙ্ক। মাথার একেবারে তালুতে ঢুকেছে বুলেটটা, চুরমার হয়ে গেছে খুলি। রক্তে ভাসছে হলুদ মগজ, বিচূর্ণ খুলি। তার পায়ের কাছে পা লম্বা করে মেলে দিয়ে বসে আছে ফয়েজ আহমেদ। চোখ দুটো লাল হয়ে আছে তার। চারপাশে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে ওদের লুটের মাল ভরা আটটা ব্যাগ। আর ক্লিনিং কোম্পানির বিভিন্ন সরঞ্জাম।

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে আছে ফয়েজের। ভাবাবেগে ঠোঁট কাঁপছে থর থর করে। তার কোলের ওপর মাথা রেখে পড়ে আছে

লাজুক চেহারার, দুঃসাহসী হাসান। চোখ বোজা। দম নিচ্ছে ঘন ঘন। ওর পাঁজরের সামান্য নিচে, পাকস্থলী বরাবর একটা মোটা কাপড়ের অতিরিক্ত ব্যাগ কয়েক ভাঁজ করে চেপে ধরে আছে ফয়েজ। এরই মধ্যে রক্তে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে ব্যাগটা।

হাঁটু গেড়ে বসল মাসুদ রানা, অপলক চোখে দেখল কিছুক্ষণ আহত যুবককে। ঘন ঘন দম নিচ্ছে ও, বুকটা ওঠা-নামা করছে হাপরের মত। নিঃশ্বাসে কেমন ফ্যাস ফ্যাস শব্দ উঠছে। কেশে উঠল হাসান, মুখের দুই কশ বেয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে এল রক্তমাখা বুদ্বুদ। ওর অন্য ক্ষতটাও দেখল রানা। ডান উরুতে ঢুকেছে বুলেটটা।

'কুত্তার বাচ্চা!' অসহায় রাগে ফুঁসে উঠল মাসুদ রানা।

এমন সময় চোখ মেলল হাসান। তার অনিশ্চিত, অস্থির চাউনি এদিক-ওদিক ঘুরল কয়েকবার, তারপর স্থির হলো রানার মুখের ওপর। ঠোঁট নড়ে উঠল যুবকের, কিছু যেন বলতে চায়। কিন্তু কোন আওয়াজ বের হলো না। ওর পেটের ক্ষতের ওপর ফয়েজের চেপে ধরে রাখা ব্যাগটা সামান্য তুলে উঁকি দিল মাসুদ রানা। এক পলক দেখেই বুঝল, সত্যিই মরে যাচ্ছে ছেলেটা।

উঠে দাঁড়াল ও। 'ছেলেটাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নেয়া দরকার, রানা,' ভয়তাড়িত চড়া গলায় বলল নাদিরা।

'কোন লাভ নেই,' বিষণ্ণ মুখে এদিক-ওদিক মাথা দোলাল ও। অন্যরা ঘুরে তাকাল ওর দিকে। দৃষ্টি প্রাণহীন।

'কেন?'

'ও মারা যাচ্ছে।'

'কিন্তু সময়মত চিকিৎসা...'

'আশা থাকলে এতক্ষণে সে ব্যবস্থা নিশ্চই করতাম। এখন টানা-হেঁচড়ায় কেবল কষ্টই বাড়বে ওর, কাজ কিছুই হবে না।

আঘাতটা মারাত্মক, ভেতরের আর্টারি ছিঁড়ে গেছে।'

চোখে পানি চিক্ চিক্ করছে মেয়েটির। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'কোন আশাই নেই?'

'না। আর দশ থেকে পনেরো মিনিট বাঁচবে হাসান বড়জোর।'

মুখ নিচু করে হাসানকে দেখতে লাগল নাদিরা। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে রেখেছে। দরদর করে পানি পড়ছে দুই গাল বেয়ে। 'তবু একবার শেষ চেষ্টা...!'

'যদি চান্স থাকত, তুমি কি মনে করো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতাম আমি? ওকে জিজ্ঞেস করে দেখো,' বিল্লাহকে দেখাল মাসুদ রানা, 'ও কি বলে!'

জিজ্ঞেস করতে হলো না। তার আগেই মাথা দোলাল দানব, 'নেই। কোন চান্স নেই।'

সরে এসে খোলা দরজার কাছে দাঁড়াল মাসুদ রানা। কাঁচা রক্তের আঁশটে গন্ধে ঘুলিয়ে উঠছে পেটের ভেতর। মৃদু কান্নার শব্দে ঘুরে তাকাল ও। প্রায় অচেতন হাসানের একটা হাত মুঠোয় পুরে কাঁদছে নাদিরা। 'আমার জন্যেই তোমার আজ এই অবস্থা। যাওয়ার আগে আমাকে ক্ষমা করে যাও, ভাই! ক্ষমা করে যাও।'

কাছে গিয়ে জোর করে উঠিয়ে আনল তাকে মাসুদ রানা। 'ওঠো। নিচে যাও।' তাকে সবুজ আর বিপুলের হাতে তুলে দিয়ে হাসানের কাছে ফিরে এল ও। স্থাণুর মত বসে থাকা ফয়েজের হাতে একটা হাত রাখল সান্ত্বনার ভঙ্গিতে। চোখ তুলল হেভিওয়েট, চেহারা দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না কান্না ঠেকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে। 'হাসান মরে যাচ্ছে, মাসুদ ভাই,' ফ্যাঁসফেঁসে স্বরে বলল লোকটা।

উত্তর না দিয়ে ছেলেটার পাশে বসে পড়ল রানা। টকটকে

লাল কাপড়টা দেখল কয়েক মুহূর্ত, ওটা চুঁইয়ে বেরোনো রক্তে ফয়েজের হাত, কভারলস সব ভিজে গেছে। একজন মানুষের শরীরে এত রক্ত থাকতে পারে আগে কখনও ভাবেনি রানা।

স্নেহে হাসানের ঘামে ভেজা কপালে হাত বোলাল ও, আঙুল দিয়ে আঁচড়ে দিল এলোমেলো চুল। ছাইয়ের মত হয়ে গেছে মুখটা, আরও ঘন, গভীর নিঃশ্বাস ছাড়ছে হাসান, যেন ভারি কোন ওজন চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তার বুকের ওপর।

'কোন ভয় নেই, হাসান,' কানের কাছে মুখ নিয়ে নিচু গলায় বলল রানা। 'তুমি ঠিক হয়ে যাবে। ভাল হয়ে যাবে তুমি। হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি আমরা তোমাকে। দেখো, এক সপ্তার মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে তুমি। সেরা ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করানো হবে তোমার। শুধু একটু ধৈর্য ধরো, মন শক্ত করো। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি জানি তুমি সহজে হাল ছাড়ার ছেলেই নও, যত যা-ই হোক...'

এমনি আরও অনেক কিছু বকে যেতে লাগল রানা নিচু, একঘেয়ে স্বরে। অনেকক্ষণ পর চোখের দু'পাশ কুঁচকে উঠতে দেখা গেল হাসানের, নড়ে উঠল ঠোঁট, যেন বলতে চায় কিছু। ওর মুখের সামনে কান নিয়ে এল মাসুদ রানা।

'আমি...আমাকে...,' থেমে গেল হাসান। মারা গেছে দুঃসাহসী, লাজুক চেহারার ছেলেটা। এইমাত্র ছিল, সংগ্রাম করছিল বেঁচে থাকার, হঠাৎ নেই হয়ে গেছে। এক ঝলক তাজা রক্ত বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে, মাথাটা এক পাশে হেলে পড়ল। ঠিক যেন ঘুমিয়ে পড়ল শ্রান্ত যুবক। ওর চুলগুলো আরেকবার নেড়ে দিল মাসুদ রানা, জোর করে উঠে দাঁড়াল।

'ওঠো,' কঠোর স্বরে ফয়েজের উদ্দেশে বলল ও। 'কভারলস বদলাও। বসে থাকলে চলবে না এখন।'

নেমে এল রানা ভ্যান থেকে। কারও দিকে তাকাচ্ছে না। একটা সিগারেট ধরাল। ভ্যানের গায়ে হেলান দিয়ে টানতে লাগল। চিন্তা করছে। অন্যমনস্ক। সবুজ, বিপুল, নাদিরা অনুমান করে নিয়েছে কি ঘটেছে। কেউ কোন প্রশ্ন করল না ওকে। পাশ দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে ভ্যানে উঠল তারা মৃত সহকর্মীকে দেখার জন্যে।

নাদিরাও দেখল। তারপর কাঁপতে কাঁপতে নেমে এল ভ্যান থেকে। কাঁদছে না এখন আর, কেবল ফোঁপাচ্ছে। 'এখন কাঁদাকাটির সময় নয়, নাদিরা। শান্ত হও, সামনে অনেক কাজ আমাদের,' বলল মাসুদ রানা।

'আগে কখনও চোখের সামনে কাউকে মরতে দেখিনি,' নিচু, কাঁপা গলায় বলল মেয়েটি। 'এই প্রথম।' উদ্‌ভ্রান্তের মত রানার দিকে তাকাল। 'ব্যাপারটা কেমন...কেমন অদ্ভুত, তাই না?'

'হ্যাঁ। সত্যিই অদ্ভুত,' পাশ থেকে বলল ফয়েজ। কভারলস পাল্টে এসেছে সে।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। কেউ কিছু বলছে না। মাসুদ রানার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই সিদ্ধান্তের আশায়। রানা ভাবছে, পরের সম্পদ লুট করে গার্সিয়া ধনী, ওকে একটা শিক্ষা দিতে চেয়েছিল ও। নিজের সম্পদ খোয়া গেলে কেমন লাগে, হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল। সে কাজ হয়েছে, তবে দুটো প্রাণের বিনিময়ে। এখন নিশ্চয়ই টের পাচ্ছে গার্সিয়া কেমন লাগে।

ওর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এখন জাবের আহমেদের নিজেরগুলো বাদে লুটের মালের মধ্যে অন্য আর যে সব আছে, সেগুলো বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল ও। বিক্রির টাকাটা গোপনে হতভাগ্য হেলপারের পরিবারের হাতে তুলে দেয়া হবে।

শেখ জাবেরেরগুলো তুলে দেয়া হবে হ্যামিলটনের হাতে। কুয়েত পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে সে ওগুলো। সেই সঙ্গে হাসানের মৃতদেহেরও ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে ওটা। কিন্তু সিদ্ধান্তটা তখনই ঘোষণা করল না ও।

'অল রাইট,' বলল রানা। 'ব্যাগগুলো গাড়িতে তোলো। সরে পড়ার সময় হয়েছে।'

দ্রুত হাত চালাল সবাই। পালাবার সময় ব্যবহারের জন্যে যে দুটো গাড়ি রাখা ছিল গ্যারেজে আগে থেকে, তার ট্রাঙ্কে ভরা হলো ওগুলো। সবশেষে তোলা হলো হাসানের মৃতদেহ। বনোমো হেলপারের লাশ রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা। পুলিসই করবে তার ব্যবস্থা। যে কাপড় দিয়ে হাসানের ক্ষত চেপে ধরে রেখেছিল ফয়েজ, সেটা নিয়ে এল রানা। ম্যাচের কাঠি জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দিল। কয়েক মিনিটে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ওটা।

'চলো, রওনা হওয়া যাক।'

আধ ঘণ্টা পর পিছনের গেট দিয়ে রানা এজেন্সির বাউণ্ডারিতে ঢুকল দুটো গাড়ি। কেউ খেয়াল করল না ব্যাপারটা। দোতলায় একটা গেস্ট রূম আছে, মালপত্র নিয়ে ওটায় ঢুকল সবাই। শওকতের ওপর হাসানের মৃতদেহের ভার দিল মাসুদ রানা। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল ওরা। তারপর পড়ল লুটের মাল নিয়ে।

একটা ব্যাগ নিয়ে এল বিল্লাহ। মুখ খুলে উপুড় করে ঢেলে ফেলল সব কার্পেটে। নানা রঙের দ্যুতিতে হেসে উঠল যেন ঘরটা। ডায়মণ্ড বসানো আঁটো কণ্ঠহার, আংটি, পেনডেনট-ইয়াররিং সব চিকচিক করছে। মনে হচ্ছে যেন আগুন ধরে গেছে ওগুলোয়। সবাই সব ভুলে মোহাবিষ্টের মত চেয়ে থাকল জিনিসগুলোর দিকে। ভুলে গেল ওগুলো লুটের মাল, দু'দুটো প্রাণ ঝরে গেছে জিনিসগুলোর জন্যে।

‘দেখো,’ নাদিরাকে বলল রানা। ‘এর মধ্যে তোমাদের কোনওটা আছে কি না।’

এগিয়ে এল মেয়েটি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সব। আধ ঘণ্টা পর মাথা নাড়ল। ‘না, নেই।’

সবগুলো আবার ব্যাগে ভরা হলো। খোলা হলো আরেকটা ব্যাগ। এটার মধ্যে যা আছে, সব সুদৃশ্য চামড়ার মোড়কে রয়েছে, খোলা কিছুই নেই। প্রথম যে বড় মোড়কটা পেল, খুলে ফেলল রানা। চোখ কপালে উঠল সবার। ডায়মণ্ড আর এমারেল্ড বসানো অসম্ভবরকম সুন্দর তিন ঝালরওয়ালা সোনার নেকলেস। ডায়মণ্ডটা প্রকাণ্ড, বসানো রয়েছে মাঝের ঝালরে। বিস্ময়ে নানা ধ্বনি বেরুল একেকজনের মুখ থেকে।

‘কি এটা?’ রানার প্রশ্নে থেমে গেল সবাই। ওর মুখের দিকে তাকাল। কোনদিকে নজর নেই মাসুদ রানার, নেকলেসের মোড়কের ঢাকনা দেখছে ও গম্ভীর মুখে। ওটার ভেতর দিকে লেখা একটা নাম। সবাই পড়ল নামটা, আরেকবার বিস্ময় প্রকাশ করল সশব্দে। লেখা রয়েছে ওখানে: ডিভোল্ট ব্রাদার্স। সান ফ্রান্সিসকো।

‘তার মানে?’ বলল ফয়েজ।

চিন্তিত ভঙ্গিতে গাল চুলকাল মাসুদ রানা। ‘আমিও তাই ভাবছি।’

‘গার্সিয়া লুট করেছে ডিভোল্ট ব্রাদার্স?’

‘মনে তো হচ্ছে। অন্য বাক্সগুলো খোলো দেখি।’

নীরবে হাত চলতে লাগল সবার। সবগুলো বাক্স খোলা হলো। তারপর হাত গুটিয়ে বসে থাকল ওরা। প্রতিটা বাক্সে ওই একই নাম লেখা।

‘অন্য ব্যাগগুলোও খোলো সব একটা একটা করে।’

শেষ বিকেলের দিকে কাজ শেষ হলো ওদের। সবগুলো ব্যাগ এবং বাক্স খুলে ভেতরের জিনিসে চোখ বোলানো শেষে বসে থাকল সবাই চুপ করে। ভাষা হারিয়ে ফেলেছে প্রত্যেকে। শেখ জাবেরের মালের অর্ধেকও নেই এখানে, বিক্রি করে দিয়েছে গার্সিয়া। আছে কেবল লুটের মাল। সেন্ট লুইস, ডেনভার, শিকাগো, ডালাস থেকে লুট করা। সেই সঙ্গে লণ্ডন, রোম এবং রিওর কয়েকটা কোম্পানির সীলওয়ালা মালও আছে।

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে বসে আছে মাসুদ রানা। চোখে পলক পড়ছে খুব ঘন ঘন। অনেক, অনেকক্ষণ পর সিধে হলো ও। বুঝল, সকালে যে লোকটা গোলাগুলি শুরু করেছিল, সে বা তার মত আর যারা আছে, আসা-যাওয়া করে নিয়মিত গার্সিয়ার ওখানে, ওরা কেউ সেলসম্যান নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গার্সিয়ার হয়ে বড় বড় জুয়েলারি দোকান লুট করে ওরা। তারপর লুটের মাল পৌঁছে দিয়ে যায় রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সে।

ওখানকার পিছনের রূমে ওগুলো ভেঙে-গলিয়ে রিসেট করা হয়। ওদের নামের ছাপ বসানো হয়, তারপর বিক্রির জন্যে শো-কেসে সাজানো হয়। ও মাই গড! চুলে আঙুল চালাতে লাগল মাসুদ রানা, তার মানে গার্সিয়ার এত বড় ব্যবসা বিনা পুঁজির ব্যবসা? সব ডাকাতির মাল?

নাদিরারগুলো, যা যা পাওয়া গেল, সব আলাদা করা হলো। বাকি সব ঠেসে ঢোকানো হলো ব্যাগে। তারপর আবার ভাবতে বসল রানা। নতুন লাইনে।

'হ্যালো!' বলল মাসুদ রানা।

'ইয়েস?'

'মিস্টার জেস হ্যামিলটনকে দিন।'

'কে কথা বলবেন, প্লীজ?'

'উডওয়ার্ড।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল মমির ফিসফিসে কণ্ঠ। 'আমি দুঃখিত, মিস্টার উডওয়ার্ড।'

'হোয়াট?'

'কিসের কনসাইনমেন্টের কথা সেদিন বলেছিলেন এখন বুঝতে পারছি আমি। কিন্তু আমার পক্ষে কাজটা নেয়া সম্ভব নয়। কথা ছড়িয়ে গেছে।'

'কথা ছড়িয়ে গেছে মানে? কিসের কথা?'

'বন্ধুদের বন্ধুর দোকান লুট করেছেন আপনি...আপনারা, ঠিক না? সেই কথাটাই ছড়িয়ে গেছে। আমি দুঃখিত। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকার খুব ইচ্ছে আমার। আর হ্যাঁ, নাদিরা নামে কাউকে খুঁজছে গার্সিয়া। চেনেন নাকি তাকে?'

'শুনুন, মিস্টার...'

'দুঃখিত, কানে কম শুনি আমি।' ফোন রেখে দিল হ্যামিলটন।

চোখ কুঁচকে রিসিভারের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ মাসুদ রানা, তারপর রেখে দিল আলতো করে।

'কি হলো?' পাশ থেকে জানতে চাইল নাদিরা। ওর মুখ দেখে কিছু অনুমান করে নিয়েছে ও।

'জেস হ্যামিলটন মাল পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করছে।'

'অ্যাঁ! সে কি?'

'ভয় পেয়েছে লোকটা।' চুলে আঙুল বোলাতে লাগল রানা। চিন্তিত।

দশ

আবার মীটিং বসেছে রানা এজেন্সিতে। জরুরি পরিস্থিতির কারণে ডাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মীটিং। বিকেল গড়িয়ে যেতে বসেছে। মাসুদ রানা, বিল্লাহ, ফয়েজ আর শওকত আছে পুরানোদের মধ্যে, আর আছে ভয়ঙ্কর, দুর্ধর্ষ চেহারার এক ডজন যুবক। এরা প্রত্যেকে দীর্ঘদেহী, পেটা স্বাস্থ্যের অধিকারী। পরিষ্কার খুনীর ছাপ এদের চাউনিতে। দেখলেই কলজে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। রানা এজেন্সির সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্য এরা।

দীর্ঘ সময় ধরে চলল মীটিং।

সন্ধে জেঁকে বসেছে। গাড়িঘোড়ার প্রচণ্ড ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে ছুটছে ওরা। গাড়ি চালাচ্ছে ছদ্মবেশী নাদিরা। মাসুদ রানা বসেছে ওর পাশে। এ মুহূর্তে গোঁফ বা আঁচিল কোনটিই নেই রানার, চুলও ফিরে পেয়েছে নিজের বৈশিষ্ট্য। বিল্লাহ আর ফয়েজ, ওরাও নিজের নিজের আসল চেহারা ফিরে পেয়ে খুশি। ওরা দু'জন বসেছে পিছনে। সবুজ আর বিপুল নেই এবার সঙ্গে। ওরা ফিরে গেছে যার যার কাজে।

লিঙ্কন টানেল পেরিয়ে নিউ জার্সি টার্নপিকে উঠল গাড়ি, তারপর ছুটল দক্ষিণে। মাসুদ রানার হাতে একটা গালফ অয়েল ম্যাপ, ঝুঁকে বসে ড্যাশবোর্ডের অস্পষ্ট আলোয় ওটা দেখার কসরৎ করছে সে। পিছনের কেউ একজন নাক ডাকছে।

'তোমার ঘুম পায় না?' জিজ্ঞেস করল নাদিরা।

'অসময়ে পায় না,' বলল রানা আনমনে। দু'পাশে তাকাল ও। 'ট্রাফিকের ভিড় অন্য সময় বিরক্তিকর হলেও এখন ভালই

লাগছে আমার। বেশ নিরাপদ বোধ করছি।'

নতুন একটা উইগ মাথায় পরেছে মেয়েটি আজ। রংটা আগুনে লাল এবং কমলার মাঝামাঝি। ঘন কোঁকড়া। চেহারার সঙ্গে মানায়নি একেবারেই। কিন্তু প্রাণ নিয়ে টানাটানির মুহূর্তে সেদিকে লক্ষ করার উপায় বা সময় কোনটাই ছিল না। গ্রে রঙের ট্রেঞ্চকোট পরেছে মাসুদ রানা। বিল্লাহ আর ফয়েজও তাই পরেছে। নাদিরা পরেছে টুইড স্কার্ট এবং অ্যাঙ্গোরা পুলওভার। গাড়ির কাঁচ সবগুলো তোলা, তবু বেশ শীত করছে। টেম্পারেচার শূন্যের কয়েক ডিগ্রি নিচে। গাড়ির ট্রাঙ্কে চারটে প্রকাণ্ড সুটকেসে রয়েছে ওদের লুটের মাল। নাদিরারগুলো রয়েছে আলাদা একটা ব্রিফকেসে। মাসুদ রানার পায়ের কাছে পড়ে আছে সেটা।

'পথে কিছু কেনাকাটা করতে হবে,' বলল রানা। 'সবার জন্যেই বাড়তি কিছু গরম কাপড়-চোপড় সঙ্গে রাখা দরকার। তাছাড়া দু'য়েকটা সুটকেস, গরম কফি রাখার জন্যে থার্মোস, আর খাবার বইবার জন্যে পিকনিক চেস্ট। ওসব সঙ্গে থাকলে গাড়ি চলা অবস্থাতেই খেয়ে নিতে পারব আমরা। থামাথামির ঝুঁকি নেয়ার প্রয়োজন হবে না।'

'তুমি আশা করো আমরা এই গেরো থেকে উদ্ধার পাব?' নিচু কণ্ঠে প্রশ্ন করল নাদিরা।

'একশোবার।'

রাত দুটো। নিউ জার্সির ওপর দিয়ে দক্ষিণে ছুটছে ওদের গাড়ি ঝড়ের গতিতে। পিছনের ট্রাঙ্কে বোঝাই লুটের মাল। রানার অনুমান, দশ-বারো মিলিয়ন দাম হবে ওগুলোর কম করেও।

পিছনের সীটের নিচে রয়েছে পুরো এক প্লাটুন সৈন্যের উপযুক্ত সরঞ্জাম। ছয়টা পিস্তল, চারটে সাব-মেশিনগান, চারটে জার্মান মেশিন পিস্তল, গোটা দশেক হ্যাণ্ড গ্রেনেড, গোটা ছয়েক

স্মোক বম্ব, পর্যাপ্ত গোলা বারুদ এবং ছুরি-চাকু ইত্যাদি। জিনিসগুলো তোলার সময় ঠাট্টা করে মন্তব্য করেছিল ফয়েজ, ‘এ দিয়ে ইচ্ছে করলেই বুলগেরিয়া দখল করে নিতে পারি আমরা।’

রওনা হওয়ার আগে নাদিরাকে সতর্ক করে দিয়েছে মাসুদ রানা, ‘স্পীড লিমিট ব্রেক করবে না ভুলেও। তাতে সন্দেহ জাগবে পুলিসের। স্বাভাবিক গতিতে গাড়ি চালালে পুলিস ফিরেও তাকাবে না। খেয়াল রাখবে, কোন মতেই পুলিসের নেক্ নজরে পড়া চলবে না।’

ওর পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে মেয়েটি। শুধু যেখানে হাইওয়ে পেট্রলের ভয় কম, সেখানে একটু জোরে চালাচ্ছে। অথচ ওদের আশপাশে প্রায় সবাই ক্রমাগত বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে আইনকে। যে যত জোরে পারে ছুটছে। কিন্তু রানার এক কথা, গতি বাড়াবে না। ঝুঁকে পড়ে ম্যাপ দেখছে ও নিবিষ্ট মনে, তর্জনী দিয়ে রুট ট্রেস করছে।

‘কাল হয়তো সমস্যা একটা দেখা দেবে,’ অন্যমনস্কের মত নিজেকেই শোনাচ্ছে যেন ও। ‘নিউ ইয়র্ক থেকে যে কয়টা স্টেটে যাওয়ার রাস্তা আছে, সবগুলোয় গার্ড বসিয়ে দেবে এফবিআই। সবগুলো টার্নপিক, ন্যাশনাল হাইওয়েতে আড্ডা গাড়বে ওরা।’

নাদিরা বলল, ‘বিমানে চড়লে কি অসুবিধে? অথবা ট্রেন বা বাসে?’

‘ভুলে যাও। গার্সিয়া ডাকাতির ঘটনা রিপোর্ট করার সঙ্গে সঙ্গে ওসব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে পুলিস। সীল করে দিয়েছে। ওরা অনুমান করে নেবে দক্ষিণই আমাদের জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ এ মহূর্তে, অতএব সেদিকেও সব রাস্তায় ঘাঁটি গাড়বে ওরা। সব টার্নপিকে নজর রাখবে। কাজেই আমাদেরকেও পাল্টা ব্যবস্থা নিতে হবে। যতদূর পারা যায়, মেইন রোড এড়িয়ে

সেকেণ্ডারি রোড ধরে চলতে হবে।'

'কিন্তু টাকা?' বলল মেয়েটি। 'সঙ্গে ক্যাশ তো বেশি নেই। কোত্থেকে জোগাড় হবে তা?'

'নেই। কিন্তু হতে কতক্ষণ?'

'মানে?'

'মানে দামী দামী কিছু জুয়েলারি বিক্রি করে টাকা জোগাড় করব। ট্যুর অ্যালাউন্স বা টি. এ, যাই বল।'

দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলল নাদিরা, 'সেটা কি ঠিক হবে?'

'কোনটা ঠিক হবে তাহলে, যার যার ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা? সেটা পুলিস আর এফবিআইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে "ওরা ওদিকে চলেছে, ওরা ওদিকে চলেছে?" '

'তাইতো?'

'কাজেই বিক্রি করতেই হবে ওর থেকে। সবাইকে কিছু না কিছু বিক্রি করতে হবে জায়গা বুঝে। একা কারও পক্ষে বেশি জিনিস নিয়ে বের হওয়া উচিত হবে না। তাতে অবশ্যই সন্দেহ জাগবে মানুষের। আবার একবারে বেশি কিছু বিক্রি করারও প্রয়োজন নেই, পথ চলার মত টাকা জোগাড় হলেই হলো।'

চুপ করল মাসুদ রানা। মন দিল ম্যাপ দেখায়। 'আর একঘণ্টা পর বাঁক নিতে হবে ডানে, ফিলাডেলফিয়ার পথ ধরতে হবে। একদিন বিশ্রাম ফিলাডেলফিয়ায়। একদিন বিশ্রাম। ব্যবসা করে অর্থোপার্জন। তারপর ফের যাত্রা। রাতের বেলা।'

'তারপর?' মৃদু কণ্ঠে বলল নাদিরা।

'ঠিক নেই। সময় সুযোগ বুঝে রাত-দিন সবসময় চলতে হবে, পালা করে। আসল কথা কোন প্যাটার্ন সৃষ্টি করতে চাই না আমরা। কিছু টের পেতে দিতে চাই না ইটালিয়ান হারামজাদাকে।'

'তুমি ঠিক জানো ও আসবেই?'

'কে, গার্সিয়া? খুব বেশি পিছনে নেই ও আমাদের। সঙ্গে পুলিস এফবিআই-ও আসছে। একদম শিওর আমি।'

কিছুক্ষণ নীরবে ড্রাইভ করল মেয়েটি। রানার কথায় ভয় ধরে গেছে নতুন করে। ঘন ঘন ভিউ মিররে তাকাল কয়েকবার, পিছনে সন্দেহজনক কোন গাড়ি চোখে পড়ে কিনা দেখার আশায়। 'কিন্তু রানা, এত জায়গা থাকতে আমরা মায়ামিতেই কেন যাচ্ছি?'

'তুমি কোথায় যেতে সাজেস্ট করো?'

'মিডওয়েস্ট,' বলল নাদিরা। 'শিকাগো, অথবা লস অ্যাঞ্জেলেস, যেখানে আমরা যেতে পারি চিন্তাও করবে না ওরা।'

'মায়ামির ক্ষেত্রেও সেই একই কথা খাটে। ও দুটোর মত মায়ামিও বড়, জনসংখ্যার চাপে পেরেশান।'

এক সময় কামডেন প্রবেশ করল ওরা। শহরটা ছোট, তবে ছিমছাম। পথের দু'পাশে দেখতে দেখতে এগোল রানা। পিছনে এখন দু'জনেই নাক ডাকছে। ডজনখানেক হোটেল-মোটেল পেরিয়ে এল ওরা, কোনটায় ভ্যাকান্সি নোটিস দেখা গেল না। অবশেষে পাওয়া গেল যা খুঁজছে। নাম ফ্লো-মার'স। কপালে ঝুলছে রূম খালি নোটিস। ভ্যাকান্সির দুই নম্বর 'এ' নেই, জায়গাটা ফাঁকা।

হয়তো স্বামী-স্ত্রী, নিজের নিজের নামের প্রথম অংশ জুড়ে নাম দিয়েছে হোটেলের। কি নাম হতে পারে ওদের? ভাবল রানা, ফ্লোরেন্স-মার্টিন?

ভবনটা এক তলা, বেশ পুরানো ধাঁচের। ইউ শেপড্। সার দেয়া কামরা। খুশি হয়ে উঠল রানা। গাড়ি নিয়ে সোজা নিজের নিজের রূমের দরজায় পার্ক করতে পারে বোর্ডার। গাড়ি ছেড়ে

সিঁড়ি বেয়ে তিন ধাপ উঠলেই রূমের দরজা। পার্কিং লট নেই, লবি নেই, কিচ্ছু নেই। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল গাড়ি নাদিরা। ইঙ্গিতে হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল রানা।

'স্টার্ট চালু রাখো,' বলল রানা। 'আমাকে যদি ছুটে আসতে দেখো, চট্ করে ঘুরিয়ে নেবে গাড়ি।'

কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। পাঁচ মিনিট পর হাসিমুখে ফিরে এল মাসুদ রানা। 'দারুণ। পাশাপাশি দুটো ডবল রূম পাওয়া গেছে। আট, নয়। নিয়ে ফেললাম।'

'আসল নামে?'

'পাগল নাকি?'

'কে কার সঙ্গে রূম শেয়ার করবে?' হঠাৎ প্রশ্ন করল নাদিরা।

ব্যাপার টের পেয়ে হাসল রানা। 'লেডিস ফার্স্ট। তুমিই বলো কাকে নিয়ে শেয়ার করতে চাও। ওরা দু'জনেই,' ইঙ্গিতে পিছনের সীট দেখাল ও, 'ভাল মানুষ। যাকে বলে পারফেক্ট ভদ্রলোক। তোমার কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই।'

আঁতকে উঠল মেয়েটি। 'কিন্তু ওরা ভীষণ নাক ডাকে।'

'না না। নিঃশ্বাস নেয় গভীরভাবে, এই যা।'

'হয়েছে হয়েছে,' মুখ ঘুরিয়ে বাইরে তাকাল সে। 'বুঝেছি। তোমার সঙ্গেই শুতে হবে আমাকে।'

'আমার সঙ্গে?'

'মানে তোমার রূমে আর কি!'

'কিন্তু আমারও তো নাক ডাকে।'

'বিছানা?'

'বিছানা কি?'

'দুটো করে তো? নাকি একটাই?'

‘এই যাহ্! তা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি!’ জিভ কাটল রানা। ‘দাঁড়াও, গাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল ও, ‘শুনে আসি।’

‘থাক,’ ওর কোটের আস্তিন টেনে ধরল নাদিরা। ‘আর শুনে আসতে হবে না। ভেতরে গিয়েই দেখা যাবে।’

‘ঠিক আছে। ওহ্, আরেকটা কথা।’ পকেট থেকে চকচকে কিছু একটা বের করল রানা। ‘এটা পরে নাও রিং ফিঙ্গারে।’

‘কি?’

‘ওয়েডিং রিং।’

‘আবার?’

‘হ্যাঁ। অচেনা জায়গা। আমরাও আগন্তুক। কি দরকার মানুষের মনে প্রশ্ন উদয় হওয়ার সুযোগ করে দেয়ার? ওটা তোমাকে পরা দেখলে লোকে ভাববে...’

‘আমি তোমার বউ,’ ওর কথা শেষ করল মেয়েটি।

‘আমিও চাই লোকে তাই ভাবুক। অনেক ঝামেলা কমে যাবে তাহলে।’

আংটিটা রানা নিজেই পরিয়ে দিল নাদিরার হাতে। সামান্য ঢিলা, তবে মানিয়েছে চমৎকার। ‘এটা তোমার পকেটে এল কি করে?’ জানতে চাইল মেয়েটি।

‘রওনা হওয়ার আগে বের করে রেখেছিলাম, বিপদে কাজে লাগতে পারে বলে। এখন দেখ, সত্যিই লেগে গেল।’

ট্রাঙ্ক থেকে সুটকেসগুলো বের করে হোটেল রূমে নিয়ে এল ওরা। ব্রিফকেসটাও আনা হলো। অন্ধকারে ডুবে আছে অন্য সব রূম। ঘুমে বেহুঁশ সবাই। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। চেইন লাগিয়ে দিল। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা বিছানায় উঠে পড়েছে নাদিরা।

দুটো সিঙ্গেল বিছানা দেখে নিশ্চয়ই আশ্বস্ত হয়েছে মেয়েটি, ভাবল রানা। ঘরে ঢোকার দশ মিনিটের মাথায় ঘুমিয়ে পড়ল অন্যরা। ঘুম নেই কেবল মাসুদ রানার চোখে। রাস্তার দিকের একটা জানালা সামান্য ফাঁক করে চেয়ার নিয়ে বসে আছে ও। পাহারা।

পরদিন এগারোটার সামান্য পরে ঘুম ভাঙল নাদিরার। চোখ পুরোপুরি মেলার আগেই বুঝে গেল কোথায় আছে ও। কেন এসেছে এখানে। পাশের বিছানায় চোখ পড়তে ঘুমের রেশ কেটে গেল। খালি বিছানাটা। মাসুদ রানা নেই।

তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়ল সে। জানালার পাল্লা খোলা দেখে সেদিকে এগোল। সামনেটা ফাঁকা, গাড়ি নেই। ব্যাপার কি? দরজা খুলে উঁকি দিল ও। সামনেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল ফয়েজকে। দরজার শব্দে ঘুরে তাকাল সে। মেয়েটিকে দেখে হাসল। 'ঘুম ভাঙল?'

লজ্জা পেল ও। 'খুব ধকল গেছে তো গত দিনটা। তাই... ।'

'গোসল করলে করে ফেলুন। আমি আপনার নাস্তা দিতে বলি।'

'ওরা কোথায়?'

'মাসুদ ভাই? বিল্লাহকে নিয়ে আশপাশটা চক্কর দিয়ে দেখে আসতে গেছেন। আমাকে রেখে গেছেন আপনাকে আর সুটকেসগুলো পাহারা দিতে।'

'কি দেখতে গেছে?'

'তেমন কিছু না। এমনিই জায়গাটা ঘুরেফিরে দেখা আর কি। আর কিছু কেনাকাটাও আছে অবশ্য। মাসুদ ভাই একটা লিস্ট বানিয়ে নিয়ে গেছেন।'

'আমার জন্যে টুথ ব্রাশ আর পেস্ট আনলে হয়। ওসব কিছুই নেই।'

ওর কথা পুরোপুরি শেষ হওয়ার আগেই গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখা গেল দ্বিতীয় ফোর্ডটাকে। পরে প্রয়োজন হবে বলে অন্য যে দুটো গাড়ি প্রস্তুত ছিল, এটি তার একটি। চালাচ্ছে মুত্তাকিম। ওদের একেবারে নাকের ডগায় এসে থামল গাড়ি। বেরিয়ে এসে পিছনের ফুটবোর্ডে রাখা দুটো নতুন সুটকেস বের করল মাসুদ রানা। দোলাতে দোলাতে উঠে এল বারান্দায়। দুই সুটকেস ভর্তি জিনিসপত্র কিনে এনেছে ও।

টুথ ব্রাশ, পেস্ট, রেজর, অ্যাসপিরিন, শেভিং ক্রীম, কোলন, পাউডার, এক বোতল ভদকা, এক বোতল স্কচ্, সিগারেট, ক্যাণ্ডি বার, ক্র্যাকার্স, ইনসট্যান্ট কফি, থার্মোস জাগ ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা ব্রাশ আর পেস্ট নিয়ে বাথরূমের উদ্দেশে ছুটল নাদিরা।

গোসল সেরে তরতাজা হয়ে বেরিয়ে এল একবারে। 'খবরের কাগজ এনেছ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। এই নাও,' এক কপি এনকোয়েরার এগিয়ে দিল মাসুদ রানা।

প্রথম পৃষ্ঠাতেই বড় করে ছাপা হয়েছে খবরটা। হেডিং: নিউ ইয়র্কে এক মিলিয়ন ডলার মূল্যের জুয়েলারি লুট। পুলিস দুষ্কৃতকারীদের খুঁজছে।

'এক মিলিয়ন?' চোখ কোঁচকাল নাদিরা। 'তার মানে? কাকে কে ধোঁকা দিতে চাইছে?'

'গার্সিয়া দিতে চাইছে পুলিস এবং অন্যান্যদের। তুমি নিশ্চই আশা করো না ওই দোকানে দশ-বারো মিলিয়ন মূল্যের লুটের মাল রয়েছে তা সবাইকে জানিয়ে দেবে ও? খবরটা পড়ার পর থেকে কেবল হাসি পাচ্ছে আমার। ব্যাটা পড়েছে মহাফ্যাসাদে।

কইতেও পারছে না, সইতেও পারছে না। যাকগে, নাস্তা এখানেই আনিয়ে নিতে চাও, না বাইরে গিয়ে খাবে? সামনে ভাল একটা রেস্টুরেন্ট দেখে এলাম, যদি যেতে চাও...'

'চাই,' বাধা দিল মেয়েটি।

'অল রাইট। তৈরি হয়ে নাও।'

কত ঘণ্টা পর গরম খাবার জুটল কপালে, খেয়াল নেই। একেকজন দু'জনের সমান খেলো ওরা, বিল্লাহ খেলো তিনজনের। একটা কর্নার বুদে বসেছে ওরা। মাসুদ রানা এমন আসন বেছে নিয়েছে, যেখান থেকে প্রবেশ পথ পরিষ্কার দেখা যায়। খাওয়ার ফাঁকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে ও সেদিকে।

প্রথম কাপ কফি ওদের শেষ হওয়ার পথে, এই সময়ে জানতে চাইল রানা কার কাছে কত ক্যাশ আছে। নাদিরার হাত ব্যাগ খুঁজে তিনশো ডলারের কিছু বেশি পাওয়া গেল। ফয়েজের কাছে চল্লিশ এবং বিল্লাহর পঁয়ষট্টি। রানার পেটমোটা মানিব্যাগ থেকে বের হলো পুরো দুই হাজার। 'যথেষ্ট নয়,' মন্তব্য করল ও। 'সঙ্গে আরও ক্যাশ থাকা প্রয়োজন।'

'মাল কিছু বেচে দিলে হয়,' বলল বিল্লাহ।

'আমিও তাই ভাবছি,' বলল রানা। 'বোঝাও কমবে, কাজও হবে।' দুই নম্বর কাপ শেষ করে সিগারেট ধরাল ও, টেবিলে দুই কনুইয়ের ভর চাপিয়ে ঝুঁকে বসল। 'শোনো, তোমরা তিনজন তিন দিকে...'

নিচু গলায়, থেমে থেমে বলে যেতে লাগল ও কাকে কি করতে হবে। প্রথমে গাড়ি নিয়ে ফিলাডেলফিয়ার কোন শপিং সেন্টার বা আর কোন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যাবে ওরা, ওখানে নেমে পড়বে সবাই, এক এক জন রওনা দেবে একেকদিকে। হেঁটে অথবা ট্যাক্সি চেপে। নাদিরাকে একাজে সঙ্গে নেয়ার ইচ্ছে

ছিল না, কিন্তু এবারও ওর কাছে অবশেষে নতি স্বীকার করল রানা। যাবেই সে।

ফয়েজ বেছে নিল পুরুষদের হাতঘড়ি। চমৎকার এনগ্রেভ করা অ্যান্টিক হাতঘড়ি। ওর মধ্যে ভাল ভাল দেখে গোটা ছয়েক বেছে নিল সে। বেশি ইচ্ছে করেই নিল না, তাতে ফুলে থাকবে পকেট, ঢল ঢল করবে। 'একেক দোকানে একটার বেশি বিক্রি করা চলবে না,' পরামর্শ দিল রানা। 'কিছু যদি কেউ জানতে চায়, বলতে হবে, ঘড়িটা তার বাবার ছিল। তিনি মারা গেছেন। এ মুহূর্তে কিছু নগদ টাকা দরকার, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিক্রি করতে হচ্ছে জিনিসটা।'

'যদি নাম জানতে চায় আমার?'

'বলবে।'

'আসল নাম?'

'না। তবে আমার মনে হয় আসল-নকল কোন নামই জানতে চাইবে না কেউ।'

'দাম কত চাইব?'

'পাঁচশো দিয়ে শুরু করবে,' বলল রানা। 'হয়তো হেসে উড়িয়ে দেবে কেউ কেউ, আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে ভাব দেখাবে। কিন্তু হাল ছেড়ো না, দর কষাকষি করবে। যদি প্রয়োজন বোঝো, দুইশো পর্যন্ত নামবে। তারপরও যদি আরও কম করাবার জন্যে চাপাচাপি করে, বেরিয়ে আসবে। তবে আমার মনে হয় ওরা তোমাকে যেতে দেবে না। ঘড়িগুলোর অ্যান্টিক ভ্যালু আছে, ঠিকই কিনবে শেষ পর্যন্ত।'

নাদিরার দিকে ফিরল মাসুদ রানা। 'তুমি নাও বিয়ের আংটি, সলিটেয়ার আর হেয়ার ব্যাণ্ড। একটার বেশি আংটি এক দোকানে বের করবে না। জানতে চাইলে বলবে, অল্প দিন হলো ডিভোর্স

হয়েছে স্বামীর সঙ্গে। এবং তার দেয়া কোন জিনিস রাখতে চাও না তুমি। ওদেরকেই দাম অফার করতে বলবে, তুমি বলবে তার সঙ্গে আরও ফিফটি পারসেন্ট যোগ করে। শেষ পর্যন্ত চাপাচাপি করবে, দাম যত বেশি আদায় করে নিতে পারবে, ততই মঙ্গল। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু একটার বেশি আংটি দেখালে ক্ষতি কি? অনেক মেয়েরই একাধিক ওয়েডিং রিং থাকে।'

'ঠিক আছে,' একটু চিন্তা করে বলল রানা, 'তবে জায়গা বুঝে।'

'আর তুমি আর বিল্লাহ? তোমরা কি করবে?'

'আমরাও একই কাজে বেরোব।'

ঠিক হলো হোটেলে ফিরে যার যার জিনিস নিয়েই বেরিয়ে পড়বে সবাই। কাজ করবে বিকেল পর্যন্ত। তারপর পাঁচটায় মিলিত হবে এক জায়গায়।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা

মৃত্যুর প্রতিনিধি

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

উপসাগরীয় যুদ্ধের কয়েকদিন আগে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেন এক বৃদ্ধ, ধনকুবের আরব শেখ।
বেহাত হয়ে গেল তাঁর বহুমূল্য রত্নভাণ্ডার।
জিনিসগুলোর খোঁজ পাওয়া গেল কয়েক বছর পর, নিউ ইয়র্কের এক দোকানে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে ওগুলো।
শেখের একমাত্র নাতনী, নাদিরার সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিল মাসুদ রানা, স্রেফ ডাকাতি করে বসল পৃথিবীর ব্যস্ততম শহর নিউ ইয়র্কের বুকে, প্রকাশ্য দিবালোকে।
এবং তার পরপরই জড়িয়ে পড়ল ভয়ঙ্কর বিপদে।
মাফিয়া ডন পাওলো গার্সিয়ার ছেলে, রবার্টো গার্সিয়ার লেজে পা দিয়ে ফেলেছে রানা।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০